ধ্রুবচরিত্র।

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

কলিকাতা,

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ফরিদপুর হইতে
প্রকাশিত।

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন বক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯০

মূল্য।/০ পাঁচআনা।

উৎসর্গ ।

যাঁহাদিগের নাম সাধু, যাঁহারা শান্ত, অভিজ্ঞ ও নিষ্কপট, সত্যকথা যাঁহাদিগের হৃদয়ে জ্যোৎস্নার প্রীতি বিস্তার করে, যাঁহারা সংসারের দেবতা, ধ্রুবচরিত্র, তুমি নির্ভয়ে তাঁহাদিগের করে আশ্রয় গ্রহণ কর, আদর অনাদর সমান সন্তোষ বিধান করিবে।

বিজ্ঞাপন।

ধ্রুব চরিত্রের সারাংশ কেবল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র, ঐতিহাসিক ভাগও যথাসম্ভব প্রামাণিক-গ্রন্থ-সম্মত; তবে স্থানাদির নিষ্কৃষ্ট নির্ণয় এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না থাকায়, গ্রন্থকার তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

ব্রহ্মদর্শন ভারতের সুস্থিততম ধর্ম্ম। আর্য সাধুচরিত্রমাত্রের সহিত এই ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। গ্রন্থকারের বিবেচনায় বিষয়টী অতি গম্ভীর। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দূরে দূরে থাকিয়া তাহার কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত দুই চারিটী অশুদ্ধ প্রয়োগ রীতির অনুরোধে এই গ্রন্থে ত্যাগ করা যায় নাই। অপরাপর অবতরণিকাদি-মুখেই বলা হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

অশুদ্ধ-শোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৫	অলকাগ্র	কেশাগ্র
১৫	৭	অলক	কেশাগ্র

ধ্রুবচরিত্র।

অবতরণিকা।

সংসারে নানা অদ্ভুত সৃষ্টি, কিন্তু কোনটীই চিরস্থায়ী নয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, অণু, পরমাণু প্রভৃতির সংযোগ-বিয়োগে যাহার গঠন, যতই সুন্দর, যতই নির্দ্দোষ, যতই দৃঢ় ও অজর হউক না কেন, সংযোগ অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়, অন্তে সকলকেই এক অভিন্ন-গতির অনুসরণ করিতে হয়,—আর্য্যশাস্ত্রে এই একটী মত প্রতিষ্ঠিত বটে। অনেক সহস্র বৎসর অতীত হইল এই ভারত-বর্ষে একটী মানবমূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। ভারতের সহৃদয় প্রাণিমাত্রেরই ইচ্ছা ছিল মূর্ত্তিটী চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু তা হইবে কেন? যথাকালে সনাতন নিয়মের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া, নশ্বর দেহ নিজকায সাধিয়া চলিয়া গেল।

চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটী অপেক্ষাকৃত অনশ্বর স্মৃতি রাখিয়া যাইতে ভুলিল না। প্রাচীনের মুখে নবীন তাহার কথা শুনিল, ও স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয়ে জাজ্বল্যমান প্রতি-লিপি ধারণ করিল; হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে সংক্রান্ত হইল, চিত্রপরম্পরা লোকপরম্পরায় অবরোহণ করিল।

এই চিত্রখানি এখন আমাদের হৃদয়াবরূঢ়। অনন্ত হৃদয়ে সঞ্চারণ করিয়াও চিত্রের সারবত্তা অক্ষুণ্ণপ্রায় রহিয়াছে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সংসারে সারাসার সর্ব্বস্পর্শী আর একটী অদ্ভুত পদার্থ আছে; আমাদের কথায় তাহাকে অতিরঞ্জন

বলা যায়। এই মহাবল পদার্থের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা এ অবসরের কার্য্য নহে। কত শত স্বভাবসুন্দর চিত্র যে ইহার করকমলে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে, ইহা অনেকেরই স্বীকার্য্য। তবে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, যেমনই হউক না কেন, ইহার বিচিত্র আচ্ছাদন অবাধে স্থায়িত্বে উপনীত হইতে পারে না। প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে কেহ উজ্জ্বলবর্ণছটা নিক্ষেপে কৌতূহলী হউক, বনদেবী তাহা বৃষ্টিজলে ধৌত করিয়া নিরীক্ষণের অবসর দেখিবেন, অকৃত্রিমে কৃত্রিম মিশুক, সরলহৃদয় অবশ্যই প্রতীকার আকাঙ্ক্ষা করিবে।

এইরূপ কোন আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমানসময়ে শ্রীমান্ ধ্রুবের চরিত্রচিত্রে উপনীত হইয়াছে, ইহা যাঁহাদিগের ধারণা, উপস্থিত ক্ষুদ্রপ্রবন্ধ সবিনয়ে তাঁহাদিগের সকরুণ দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছে। প্রার্থনার যথোচিত সম্মান রাখিতে পারিবে কি না, যথেষ্ট সন্দেহস্থল, এবিষয়ে চিত্রের দেবতা সহায় হউন; পক্ষান্তরে প্রার্থনা উপযুক্ত সম্মান পাইবে কিনা তাহাও অল্প সন্দেহের বিষয় নহে, সে বিষয়ে—আর কে হইবেন?—পাঠকের দেবতাই সহায় হউন।

পাঠক অবশ্যই নবীন, প্রাচীন থাকিলেও রুচিগুণে সকলেই নবীন; চিত্রটী প্রাচীন, অতি প্রাচীন, তবে কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটিবে? না ঘটিবারই কথা বটে। কিন্তু একথা বোধ হয় তেমন বিচারসহ হইবে না। সংসারে সকলই পুরাতন হয় সত্য, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংসারে যাহা সার তাহা সহজে পুরাতন হয় না। কাষ্ঠের সার শীঘ্র পুরাতন হয় না, বালকটীও অবগত আছে। কাষ্ঠের সার স্থূল, দুগ্ধের সার

সূক্ষ্ম, স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মের স্থায়িত্ব অধিক হওয়াই সম্ভব, সুতরাং দৃশ্যের যাহা সার, যাহা চমৎকারিতা, যাহা দেখিয়াই হৃদয় মুগ্ধ হয়, সেই হৃদয়স্পর্শী সারাংশ কেন সহজে পুরাতন হইবে? হয়ত তাহা কদাচই পুরাতন হয় না। এই যে একটী অনন্ত-কালের প্রকাশ্য দৃশ্য আকাশের চাঁদ, তাহার কোন অংশ সৌন্দর্য্যের দর্শনে পুরাতন হইয়াছে? না, এইরূপ অনেক বস্তুই পুরাতন হয় না সত্য। সব চাঁদ পুরাতন হইলে মানুষ বাঁচিত কি না সন্দেহ। আর প্রকৃত পক্ষেই নিত্য নূতন চাঁদের উদয় হইলে জগৎ প্রতিষ্ঠাহারা হইয়া পড়িত।

আকাশে চাঁদটীই চাঁদ, সংসারে সাধুগণ চাঁদ। এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাণতর্পণ বস্তু আর বড় অধিক দৃষ্টি-গোচর হয় না। বিচিত্র ভাণ্ডার সংসারে সৌন্দর্য্যের কৃপণতা নাই, সুন্দর বস্তু অসংখ্য, কিন্তু এমন নিষ্কলঙ্ক জীবন্ত সৌন্দর্য্য অন্যত্র দুর্ল্লভ। সহসা একথা হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে, সৌন্দর্য্যের জীবনে সহজে দৃষ্টি প্রসারিত হইতে পারে না। উদ্‌বাতময় সংসারভূমে ইতঃস্ততঃ অনেক পরিদর্শন আবশ্যক করে, নতুবা অপাততঃ বিশ্বাস-দৃষ্টিই করিতে হয়। বস্তুতঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই অদ্ভুতমূর্ত্তি বিশাল সংসার যেন মহারুদ্রের ছায়া দেখাইয়া আপনমনে উন্মত্তনৃত্য নাচিয়াই চলিয়াছে, আর সাধুগণ তাহার ললাট-দেশ অধিকার করিয়া সুধাময় চরিত্রে উন্মাদে মধুরতা মিশাইয়া যাইতেছেন। অতএব সামঞ্জস্যের বিশেষ অসদ্ভাব লক্ষিত হয় না, আমরা মহাসাধুর পদধূলি লইয়া অগ্রসর হই।

—

প্রথম পল্লব।

একটী বালকমাত্র দেখাইবার জন্য আমার সংক্ষিপ্ত আয়োজন, পাঠক মহাশয়, আসুন দেখি। পরিচয় দাতা বলেন, বয়স পাঁচবৎসরের অধিক নহে, তাহাই মানিয়া লইতে হইতেছে। শিশুটীর জন্ম আর্য্যাবর্ত্তে, অতি প্রাচীন রাজকুলে, প্রাচীন আর্য্যসুলভ রূপলাবণ্যের নিতান্ত অভাব নাই, নবীন আর্য্যাবর্ত্ত তখনও নির্জ্জীবতার স্বপ্ন দেখে নাই, তবে সেকালের ক্ষত্রিয়-বালকের আননে একবার দৃষ্টিপাত করুন।

হাঁসি হাঁসি মুখ খানি কিন্তু দেখাইতে পারিলাম না, ছেলেটী কাঁদিতেছে। হাঁসি শীঘ্র দেখা দিবে এমন আশাও নাই, কি করিব? কোন কারণে সহসা অনেকদূর হইয়া পড়িয়াছে। বালকের মুখে শব্দ নাই, কিন্তু হৃদয়ে বড় অধীরতা। অশ্রুভরে চখদুটী ছলছল করিতেছে। একে ভারতের আঁখি, তায় শিশুর তরলাভ অম্লান মুখে, ভারে ক্লান্ত হইয়াও যেন প্রাণপণে সুন্দরতা দেখাইতেছে। দুই এক বিন্দু উষ্ণজল কপোলে রেখা রাখিয়া অবসর লইতেছে। কয়েকটী অলকাগ্র ললাটে বিক্ষিপ্ত, অধর ঈষৎ প্রস্ফুরিত, মধ্যে মধ্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে কাতর, সমস্ত মুখ খানিই ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিতপ্রায়, একটী অরুণোদয় অক্লিষ্ট কমল যেন বৃষ্টির পরক্ষণেই বায়ুভরে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

রোদন সহজ বালকের ন্যায় নহে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; অভিমানে ক্ষুদ্র হৃদয়পুট আকুল। তবে কি রাজশিশু বলিয়াই এই স্বতন্ত্র ভাব?, এ তীব্র অভিমান কি উৎকট

রাজ্য-লালসা লতারই অঙ্কুর? বিতর্কে প্রয়োজন নাই, বালকের অন্তরে কিছুই লুকাইয়া থাকিবার নহে, কোমল প্রাণ এখনও ভার সহিতে শিখে নাই, তবে দেখা যাউক আমাদের ভারাহত শিশুটী কোথায় ধাবমান, কে তাহার লক্ষ্য?

শিশুটী অন্তপুরপথ অতিক্রম করিয়া এক গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করিল। প্রাঙ্গণটী নির্জ্জন, বক্ষে একটী পরিষ্কৃত সৌধ ধারণ করিতেছে, সৌধে রাজচিহ্নও বর্ত্তমান। দ্রুতপদে একটু অগ্রসর হইয়াই বালক উর্দ্ধবাতায়নে গুরুভার চক্ষুদুটী সংলগ্ন করিল। জলের বাঁধ ভগ্নপ্রায়। মুহূর্ত্ত মধ্যেই দুই চারিটী পুরস্ত্রী ত্রস্ত হরিণীর ন্যায় প্রাসাদহইতে দৌড়িয়া বাহির হইলেন। জল আর মানিল না। কেবল শিশুর বক্ষ নহে দেখিতে দেখিতে একটী রমণীর বক্ষও অশ্রুসিক্ত হইল। ললনা ত্বরায় আসিয়া বাহুযুগলে ধ্রুবকে ধারণ করিলেন; নিমেষে সোণার কমলটী জননীর নির্ম্মল হৃদয়সরসে শোভা পাইতে লাগিল।

আর একটী রমণীও সজলনয়নে ধ্রুবের মুখ মুছাইতে লাগিলেন। ইনি ধ্রুবের ধাত্রী, অপর যে দুই একটী তাহারা পরিচারিকা। প্রাচীনকালে ধাত্রীশব্দটী অনেকপরিমাণে পবিত্র ছিল, তখনকার ধাত্রী নামে এখনকার ধাই বুঝাইত না। সম্ভ্রান্ত সংসারে সদ্বংশীয় সচ্চরিত্রা ধাত্রী নিযুক্ত হইতেন। শৈশবে লালনপালনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা শিক্ষার ভারও ধাত্রীর হস্তে অর্পিত থাকিত। তাঁহার গুণে বৰ্দ্ধমান বালকটী শান্ত, সুভাষী, অভিবাদনপটু ও অন্যান্য শিষ্টতায় শোভিত হইত। ধ্রুব বাহ্যতঃ অপ্রিয় হইলেও রাজসন্তান, তাঁহার উপযুক্ত ধাত্রী ও পরিচারিকাদির অভাব ছিল না। তবে জননী সুনীতি এস্থলে পুত্রের

প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিতেন, এবং সৎশিক্ষাদানে তাঁহারই সমধিক পারদর্শিতা ছিল,—এইমাত্র প্রভেদ। ফলে সকলেই ধীর শিষ্ট ধ্রুবকে অকস্মাৎ বিচলিত দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে তাহাকে লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পল্লব।

আধিক্য-পরাঙ্মুখ পাঠকদিগকেই আমরা আশ্বাস দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছি। এখন, ধ্রুবের চক্ষে জলবিন্দু দেখা দিতে না দিতেই জননীর বক্ষ ভাসিয়া গেল। ইহা কি স্বভাবসীমা অতিক্রম করিতেছে না? শৈশবে ধ্রুব সামান্য-সন্তানভিন্ন ত আর কিছুই নহেন? তবে এ অসামান্য ভাবতরঙ্গের মূল কি? কল্পনার ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং আরম্ভেই আমাদের চিত্রটীর ভাগ্যে বুঝি উপেক্ষার চক্ষুই ঘটিল। আশঙ্কা বড় অসঙ্গত নয়, কিন্তু এত শীঘ্রই আমরা প্রতারিত হইলাম ইহাও বোধ হয় না। শৈশবে ভাবি মহাত্মা ধ্রুবের মহত্ত্বের কি একেবারে অস্তিত্বই ছিল না? না, বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে কই? সত্য বটে প্রকাণ্ড বটের বীজও অতি ক্ষুদ্র-মাত্রায় দেখা দিয়া থাকে; কিন্তু ধ্রুব যে বিশাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে চলিয়াছেন, তাহার তুলনায় মাতৃহৃদয়ের এই তরঙ্গবিন্দু-টুকু অতি ক্ষুদ্র বই আর কি? অতএব বিশ্বাস হয়, যে, পাঁচ-বৎসর বয়ঃক্রমেও ধ্রুবের আকারপ্রকারে কিছু বিশেষ সৌন্দর্য্য

ছিল; তাহা যাহার হৃদয় স্পর্শ-করিত তাহাকে মুগ্ধ অথবা ধ্রুবের পক্ষপাতী হইতেই হইত। অল্পকালের জন্য বিমাতার কিম্বা পিতারও হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহা অবিশ্বাসের কারণ হইতে পারে না। তবে আপনারা বিশ্বাস চক্ষেই দেখুন,—গৃহমধ্যে জননী নির্ভরস্নেহে ধ্রুবধনে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, চারিদিকে সাগ্রহ স্ত্রীলোক কয়টী আসন্ন; অল্প-কথায়, পিতৃসভায় অনাদৃত ধ্রুব সম্প্রতি মাতৃসভায় স্নেহসিংহা-সনে সমাসীন। অল্পকাল নিস্তব্ধেই গেল, পরে বালক কিছু সুস্থ হইলে, সুনীতি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,'ধ্রুব! কি হইয়াছে বাপ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? এইত তুমি উঠানে খেলিতে ছিলে? দাসী কই? সে তোমায় কোথায় লইয়া গিয়াছিল? তুমিত কাহারও সহিত বিবাদ করনা? কোন ছেলে কি অন্যায় করিয়া তোমার অপমান করিয়াছে? বল, রাজাকে বলিয়া তাহার শাস্তি দিব?' জননীর এতগুলি প্রশ্নে ধ্রুব কোন উত্তর দেন নাই, কেবল অঞ্চলে চক্ষু পীড়িত করিতেছিলেন; রাজার নাম শুনিয়াই হঠাৎ মুখ তুলিলেন, মুখমণ্ডলে ক্ষত্রশিশু পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল, স্থিরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,'মা, রাজা আমার অপমান করিয়াছেন।' সুনীতি অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু বিশেষ বুঝিলেন না। প্রবল উৎকণ্ঠাসত্ত্বেও পতিব্রতা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু ধাত্রী শুনিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজা কি বলিয়াছেন?' ধ্রুব—'রাজা আমায় কোলে লইলেন না; আমি রাজসভায় গিয়াছিলাম, উত্তম পিতার কোলে বসিয়াছিল, আমিও নিকটে যাইলাম, তিনি হাঁসিলেন না, দেখিলেন না, আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম ও কাঁদিয়া

ফেলিলাম, তবুও—'এক উচ্ছ্বাসে বালক হৃদয়ের এতগুলি ভার স্থানান্তর করিল, জননী কিছুই বলিলেন না, ধাত্রী বাধা দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ছোট মাতা কোথায় ছিলেন?' ধ্রুব—'ছোট মাতার দাসী আসিয়া আমাকে লইয়া গেল, তিনি পার্শ্বের ঘরে ছিলেন, আমি বলিলাম, মা, রাজা কেন আমায় কোলে লইলেন না? তিনি হাসিয়া আমাকে কোলে লইলেন, কিন্তু অনেক তিরস্কার করিয়াছেন।' আবার ধ্রুবের চক্ষে জল দেখা দিল। সুনীতি জড়প্রায়, মুখে কোনমতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। ধাত্রী মুখ মুছাইয়া বলিলেন, 'ছোট মা কি বলিয়াছেন?' ধ্রুব—'ছোট মা বলিলেন, তুমি অবোধ বালক, রাজার নিকটে কি জন্য যাও? উত্তম কোলে থাকিতে রাজা তোমায় কিরূপে কোলে করিবেন? তুমি তাঁহার কাছে আর যাইও না। আরও কত কথা বলিলেন, আমি উঠিলাম, তিনি হাসিলেন, আবার আমায় ধরিয়া রাখিতে চাহিলেন, আমি চলিয়া আসিলাম। মা, তিনি কেন আমায় তিরস্কার করিলেন?'

সুনীতি এখনও অবাক্, যে আশঙ্কায় হৃদয় শিহরিয়া ছিল তাহাই দৃঢ় হইল, শীঘ্র কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। চক্ষু দুটী শাসন না মানিয়াই কিছু অশ্রুবিসর্জ্জনে কতক উত্তর দিল। বালক ক্রোধে অস্থির, ক্রোড় হইতে উঠিয়া জননীর মুখ চাহিয়া বলিলেন, 'মা, কি জন্য উত্তর দিতেছেন না, আমি কি দোষ করিয়াছি?' আর কি সুনীতি থাকিতে পারেন? নিমেষে সব দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া পুত্রধনের বদন চুম্বন করিলেন। বলিলেন 'না ধ্রুব, তোমার কোন দোষ নাই, আমি অন্যায় করিয়াছি। কিন্তু দেখ তোমার ছোট মা অন্যায়

বলেন নাই। উত্তমকে রাজা ভাল বাসেন। লোকে কেহ কাহাকে অধিক ভাল বাসে, কেহ কাহারও অধিক প্রিয় হয়, তাহাতে অন্যের দুঃখ করিবার প্রয়োজন কি? তায় উত্তম তোমার ছোট ভাই, অপর কেহত নহে? আর পিতার কাছে কি পুত্রের অপমান হয়? তুমি ক্রোধ ত্যাগ কর। ক্রোধের, অভি-অভিমানের কি বশ হইতে আছে? সংসারে কাহারও প্রতি ক্রোধ করিতে নাই। ব্রাহ্মণগণ বলেন, যে কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হয় না, সকলের সহিত মিত্রভাব রাখিতে পাবে, সেই শ্রেষ্ঠ। তুমি শ্রেষ্ঠ হও দেখি, রাজা নাই আদর করিলেন, সকল লোকে তোমায় আদর করিবেন? একজনের অপেক্ষা সকলের আদরই ত ভাল? আর, তুমি রাজসভায় নাই গেলে? অন্যত্রও অনেক সাধু শান্ত লোক আছেন, তাঁহাদের সহিত পরিচয় কর, দেখিবে তাঁহারা কেমন আদর করেন, কত উপদেশ দেন। সুনীতি সংক্ষেপে এই ভাবের কথা কয়টী বলিয়া কার্য্যান্তরে পুত্রকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায় করিলেন, আর কাহারও বক্তৃতার আবশ্যক হইল না, সভা ভঙ্গ হইল।

যে দাসী ধ্রুবকে রাজসভায় লইয়া গিয়াছিল, ব্যাপার পরিতোষমত উদরস্থ করিতে সে ছলে কলে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, পরে শীঘ্রই আসিয়া বিশেষ সংবাদদাতার কার্য্য করিল। প্রচ্ছন্নগর্ব্বিতা বিমাতার কয়েকটী কথা যে বালকের মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে তাহা সকলেই অবগত হইলেন। কথা কয়েকটী এই—"ধ্রুব! তুমি আমার সন্তান হইতে পার নাই, সুনীতির সন্তান হইয়া জন্মিয়াছ, তবে কিরূপে রাজার প্রিয়তা লাভ করিবে?"

তৃতীয় পল্লব।

ধ্রুবের কোপ শীঘ্রই শান্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু অন্তরের ব্যথা কিছুতেই হ্রাস পাইল না। মাতা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিয়া নানাবিধ উপদেশ ও প্ররোচনা দিতে ক্রুটি করিতেন না, তথাপি ধ্রুব দিন দিন উদ্বিগ্নই হইতে লাগিলেন। নিরন্তর জননীকে নানা উপায় জিজ্ঞাসা করিতেন। কিসে ক্ষোভ মিটিবে, কাহার নিকট দুঃখ জানাইতে হইবে, কে লোকের দোষ গুণ বিচারের সর্ব্বোপরি কর্ত্তা,কে অপক্ষপাতী নির্ভীক বিচারক,—এই ভাবের প্রশ্নে ধীরা সুনীতিকে ক্রমে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এখন কি, বড় হও, বিদ্যাশিক্ষা কর, সময়ে সকল সন্ধান পাওয়া যাইবে, গুণবান হইলে পরে তুমি সকলেরই আদরণীয় হইবে, ব্যস্ত হইলে মিছামিছি মনের কষ্ট হয়,—ইত্যাদি নানা উপদেশ ব্যর্থ হইল। একদিন বলিলেন,—'ধ্রুব! তুমি এমন ব্যস্ত হইলে, দেখ, আমরা নিতান্ত নিরাশ্রয়, আমাদের কি অত মান অভিমান করিলে বাপ! চলে? রাজার প্রিয় হওয়া, রাজাসন লাভকরা, অনেক ভাগ্যের কথা, কত পুণ্যের ফল। আমি অতি পুণ্যহীন; সুরুচি সত্যই বলিয়াছেন, তুমি আমার সন্তান হইয়াছ তোমারও ধ্রুব, পুণ্যবল নাই। তোমার এখন অন্যের উপর ক্রোধ করিলে কি হইবে? লোকে অপরের সুখসৌভাগ্যে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু ধ্রুব বুঝিয়া দেখদেখি, সে বাধায় কি কিছু হয়? তুমি যদি উপযুক্ত হও, তবে তোমার ভাগ্য কি কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে? নিম্নস্থানে জল যেমন আপনি আসিতে থাকে, তেমনি সুখ-সৌভাগ্য তোমার নিকট আপনিই আসিয়া পড়িবে।

অতএব এমন উদ্বিগ্ন না হইয়া যাহাতে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহাই তোমাকে করিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, সংসারে নিজের পুণ্য-অভাবেই লোকের দুঃখ ঘটে, পুণ্যবল থাকিলে কোন দুঃখই নিকটে আসিতে পারে না।' ধ্রুব তরল নয়ন-দুটী একদৃষ্টে মাতার আননে রাখিয়া কথাগুলি শুনিলেন; ক্ষণকাল পরে উত্তর করিলেন, 'মা আমরা নিরাশ্রয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আপনি সত্য করিয়া বলুন, নিরাশ্রয়ের কি কেহ আশ্রয় এখানে নাই? রাজাসন আমি চাহি না। উত্তম রাজার প্রিয় হউক, তাহার উপর আমার কোন ক্রোধ নাই। মা! পরের দেওয়া দ্রব্য কি? আমি নিজে যাহা আনিতে পারিব তাহাই লইব। আপনি বলুন, কোন পুণ্য সঞ্চয় করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া যায়? কাহার কাছে যাইলে এমন গুণ শিখা যায় যাহা আর কেহ শিখে নাই? গুণবান্‌দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? আমি অবশ্যই তাঁহার কাছে একবার যাইব।' বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া বালকের গণ্ডস্থল আরক্ত হইয়া উঠিল, আর বলিতে পারিলেন না। পরে অতি ধীরস্বরে বলিলেন, মা! আমি আপনার সন্তান হইয়াছি উত্তম হইয়াছে, আমাকে সন্ধানমাত্র বলিয়া দিন, দেখিবেন আমি সকলকে পরাজয় করিতে পারি কি না?

আহা! অবোধ সন্তানের ওজস্বিতা জননীর হৃদয় স্পর্শ-করিল। বহুযত্নে নয়নের জল সম্বরণ করিয়া সুনীতি শিশিরময় করে পুত্রধনের মুখমণ্ডল প্রকৃতিস্থ করিলেন। শান্তস্বরে বলিলেন, ধ্রুব! নিরাশ্রয়ের আশ্রয় জগতে কেবল একজন বাপ! যাহাকে কেহই কোলে করেনা, তাহাকে এক জন মাত্র কোলে করেন।

তাঁহার নিকট যাইতে পারিলে ত হয়, তাহা কি বাপ! আমা-দের সাধ্য আছে? ধ্রুব—মা, কেন? তিনি কোথায়? উঃ—বাবা! তিনি কি আমাদের স্থায় মানুষ? মানুষে কি মানুষের দুঃখ বুঝে? তিনি দেবতা, তিনি পৃথিবীতে থাকেন না, তিনি স্বর্গে থাকেন। ধ্রুব—স্বর্গে থাকেন? মা, স্বর্গে কি যাওয়া যায় না? উঃ—বাবা তা আমি স্ত্রীলোক কিরূপে জানিব! জানিলে ত কোন দুঃখই থাকিত না। ধ্রুব—মা তবে কে জানে বলুন, আমি যে কোন উপায়ে হউক তাঁহার কাছে যাইয়া সব দুঃখ দূর করিব।

সুনীতির কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল। হায়! তথাপি সন্তানটী পাছে ব্যথা পায়, পাছে কোমলপ্রাণে নৈরাশ্যের কঠোর মূর্ত্তি দেখা দেয়,মা এই ভাবিয়াই আকুল। বহুযত্নে বলিলেন,—'আচ্ছা ধ্রুব, যে জানে আমি সন্ধান করিব, তুমি অত ব্যস্ত হইও না? দেখ, তুমি ছাড়া আর আমার কেহ নাই, তুমি ব্যস্ত হইলে আমার বড় কষ্ট হয়।' এতক্ষণে ধ্রুবের ঔৎসুক্যপথে বাধা উপস্থিত হইল। জননীর কষ্টের কথা শুনিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। বাহিরে প্রশ্নে নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অভিমানাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। হায় সংসার! দুগ্ধের বালক হইয়াও ধ্রুবকে আজ আত্মসম্বরণ শিক্ষা করিতে হইল। কিছুদিন আর বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন না, শান্ত ভাব প্রদর্শন করেন। জননী যেন একটু আশ্বাস পাইলেন। ফলে ধ্রুব বড়ই বিপদে পড়িলেন। মা ছাড়া আর কেহইনাই; শিক্ষক মহাশয় আছেন বটে, কিন্তু যাহার তাহার নিকট মনের শেল উদ্ঘাটনের ইচ্ছা হয় না, হৃদয় যেন বিচ্ছিন্ন হইতে চায়। কোন হৃদয়বিৎ মহামতির সন্ধানও ত মা বলিতে পারেন না। তবে

আর উপায় কি ? সাবধানে জননীর মুখেই ইষ্টমন্ত্র-সংগ্রহের চেষ্টা করেন ; মর্ম্মের নিদারুণ ব্রণটী অতিকষ্টে গোপন রাখিতে হয়।

যা হউক, ক্রমে জননীকেই যথামতি অভীষ্ট দেবের নাম-ধামের কিছু পরিচয় দিতে হইল। মা যাহা বলিলেন সংক্ষেপে তাহা এই,—'দেবতার নিবাস বৈকুণ্ঠেই বটে, কিন্তু সকল সংসারই যখন তাঁহার, তখন এখানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না এমন নয়। কিন্তু বালকে তাঁহার সাক্ষাৎ পাব কই ? শুনিয়াছেন কত যোগী ঋষি কতকাল যত্ন করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পান না। তবে তাঁহার নাকি বড় দয়া, দয়া হইলে বালকবৃদ্ধ সকলেই দেখা পাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণ বড় সেই-দেবতা-প্রিয়, তাঁহারা নগর ছাড়িয়া নির্জ্জন বনে গিয়া আনন্দে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকেন। ঋষিগণ তাঁহার অনেক নাম দিয়াছেন ; তাঁহার নাম নারায়ণ,বিষ্ণু, বাসুদেব, ত্রিভুবনের ঈশ্বর, দয়াময় হরি। অতি অপূর্ব্ব তাঁহার রূপ, মানুষে তেমন দেখে নাই ; স্বর্ণের ন্যায় সুস্নিগ্ধ কান্তি, সুহাসময় বদন, পদ্মপত্রের ন্যায় নয়ন, একবার দেখিলে আর কোন ক্লেশ থাকে না।'

এইরূপ মাতার কথাগুলি ধ্রুবের বড়ই তৃপ্তিকর বোধ হইতে লাগিল। হৃদয়ে অনুরাগশিশির অল্পে অল্পে সঞ্চয় লাভ করিল। ক্রমে যখন শ্রদ্ধা আসিয়া অজ্ঞাতসারে বালকের প্রেমমণ্ডিত সরল প্রাণ অধিকার করিয়া লইল, তখন উৎকণ্ঠা পূর্ণমাত্রায় উপনীত হইল। জননীর আর সম্পত্তি নাই ; উপদেশ যথাসাধ্য দিয়াছেন, ব্রত পূজাও যথোচিত অনুষ্ঠিত হইল, দেবতার দর্শন হয়না, সন্তানের তৃপ্তি নাই। জ্ঞানিগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহাই বা রক্ষা করিতে পারেন কই ? যিনি সন্তা-

নকে পরমবস্তু দেখাইবেন, তাঁহাকে সংবাদে আনা যায় না। কিন্তু হৃদয় বুঝে না, কৌশলেই সান্ত্বনা দিতে হয়।

কতদিন গেল, সাধুমহাত্মা কেহই আসিলেন না, প্রভুরও দর্শন নাই, জিজ্ঞাসা করিলে মাতা আর অধিক কিছুই বলেন না, কখন কখন বিজন অরণ্যের নাম করেন। অবলা বুদ্ধি সহসা বীর-হৃদয়ের অন্তস্তল কিরূপে লক্ষ্য করিবে? ভাবেন অরণ্যের নামে শিশুর প্রাণে ভয় আসিলে অলীক উৎকণ্ঠা দূর হইবে। যাহা হউক ধ্রুব ক্রমে বুঝিলেন গৃহে কিছুই হইবেনা। তবে কি হইবে? কোন প্রকারে বনেই যাইতে হইবে। তাকি হয়? মাকে ছাড়িয়া কি থাকা যায়? কেমন করিয়া বনে থাকিব? মাকে না দেখিতে পাইলে কি হইবে? হায়! শিশুটী সন্ন্যাসপথে অগ্রসর হইতেছিল, মাতৃ-অনুরাগ প্রভূতপরাক্রমে মধ্যে দণ্ডায়মান। কোমল বাহুলতা কি এই প্রকাণ্ড পর্ব্বত ঠেলিয়া ফেলিতে পারে? অসম্ভব সন্দেহ কি? তবে দেখা যাউক, পুণ্যের বলে কি হয়, কি না হয়, কে বলিতে পারে?

সঙ্কল্পে দোলায়মান অবস্থায় সঙ্কটাপন্ন হইয়া, ধ্রুবের এক পক্ষ অবলম্বন করা অচিরাৎ আবশ্যক হইয়া উঠিল; সুতরাং অগত্যা তিনি স্বাধীন আলোচনার আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। মাতার সাবধানতা হইতে অবকাশ পাইলেই, গৃহের কোন প্রান্তে বসিয়া অন্যমনে কি চিন্তা করিতেন; বোধ হয় বিচারে মনোনিবেশ করিতেন। বালকের আবার বিচার কি? কেন বালকের মত বিচারওত আছে? সকল বালককেই সময়ে সময়ে বিচার আশ্রয় করিতে হয়। তবে অনেকের বিচারের কেন্দ্র দেবতাটী প্রত্যক্ষ—একটী সন্দেশ

অথবা সুপক্ক কদলী ফল, ধ্রুবের ভাগ্যে তাহা অপ্রত্যক্ষ। তা ধ্রুবের নিকট একটু অধিকই আশা করা যাইতে পারে।

দেখা যাউক ধ্রুব এই এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কি করিতেছেন। নির্ম্মল মুখ খানিতে আজ সেদিনকার ভাব প্রায় নাই। চক্ষে সে তরলতা নাই, কিন্তু সেই বিস্ফারকান্তি আছে বটে। কপোল যেন কিছু শুষ্ক; ওষ্ঠাধরে একটী পাটল রেখামাত্র; অলক কয়টী সেইরূপ বিক্ষিপ্ত, কিন্তু আজ ললাট গ্রাসে সাহস করে নাই। সর্ব্বত্রই আনম্রভাব। মসৃণতায় শুষ্কতায়, তরলতায় গাঢ়তায়, বালত্বে প্রবীণত্বে মিশ্রণ। আজ আর বর্ষাবিধৌত শতদল নহে, যেন কিছু শিশিরসঞ্চারে পীড়িত। মন কি বলিতেছে? প্রথমেই মা, তিনি কি আমাছাড়া থাকিতে পারেন? আমিই বা কিরূপে থাকিব? বনে কে কোলে করিবে? কাঁদিলে মুখ মুছাইবে? কাহার কোলে শয়ন করিব? খাবার বিষয়টী সম্পূর্ণ ভুল হইয়া গিয়াছে, কেবল জননীর স্নেহামৃতময় বদনখানি তোলা পাড়া হইতেছে, মন আকুল করিতেছে। ক্ষণকাল চিত্ত অবসন্নপ্রায়, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—কেন মাইত বলিয়াছেন যাহাকে কেহ কোলে করে না, তাহাকে একজন কোলে করেন? অমনি শ্রদ্ধাদেবী অন্তরচারিণী হইয়া সমর্থন করিলেন 'মা সত্যই বলিয়াছেন।' ধ্রুবের বিশ্বাস হইল তবে আমি থাকিতে পারিব বই কি? কিন্তু মা? তিনিত একদণ্ড আমাকে না দেখিলে কাতর হইয়া পড়েন! হায়! বড় বিষাদ দেখা দিল, কিন্তু যুক্তি আসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—আচ্ছা, তিনি মাকেও কি দেখিবেন না? আমার প্রতি যদি দয়া হয়, তবে মারও প্রতি কি তাঁহার দয়া

হইবে না? শ্রদ্ধা বলিলেন তা না হইলে মা বাঁচিবেন কেন? তা অবশ্যই হইবে। হায়! সরল প্রাণ, শ্রদ্ধার কথায় কাহাকে ইতিমধ্যেই আত্মীয় করিয়া লইল; এখনই কাহার হস্তে নিজের মমতাময় সংসারের পরম বস্তুটী সঙ্কল্পে উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত-প্রায় হইল। ইহাকে কি এক প্রকার সর্ব্বস্ব ত্যাগ বলা যায় না?

যাইহউক, আর বড় অধিক বিতর্ক হইল না। হইবে কি? শ্রদ্ধা সংশয়কে আপাতত অগ্রসর হইতে দিলেন না। ক্ষুদ্র হৃদয়াগারে নিসংশয়তার উপকরণ এখনও গঠিত হয় নাই, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ না হইলে বালক পরাক্রান্ত সন্দেহের সহিত কোন শক্তিতে সংগ্রাম করিবে? তাই ভগবতী শ্রদ্ধাদেবী সম্প্রতি স্বহস্তে সংশয়ের পথ রোধ করিলেন, স্বয়ং 'দ্বিতীয় জননীর' ন্যায় সম্প্রতি শিশুকে ক্রোড়ে স্থান দিলেন।' তাঁহার প্রসাদেই ধ্রুব অসংকোচে জয়িষ্ণু পথে অবরোহণ করিলেন, দুর্গম অরণ্য যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাচীনগণ বলেন,— 'কল্যাণী জননী শ্রদ্ধার আশ্রয় না পাইয়া এই সঙ্কটে অনেকেই পথহারা হইয়া পড়েন।' সৌভাগ্যক্রমে ধ্রুব শ্রদ্ধার শ্রদ্ধাভাজন হইয়া এই ঘোর সঙ্কট সহজেই অতিক্রম করিলেন।

চতুর্থ পল্লব।

সন্ধ্যা উপস্থিত, আঁধার সর্ব্বত্রই আসিতেছে, কত লোক কত ধনরত্ন সাবধানে লুকাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সুনীতি ইতস্তত অন্বেষণ করিয়া নিজ অমূল্যরত্নের নিকট উপনীত হইলেন, আগ্রহে ধ্রুবচাঁদকে বক্ষে ধারণ করিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না যে আজ ধরিয়াও চাঁদ ধরা হইল না। জননী ত্বরায় গৃহান্তরে প্রস্থান করিয়া সন্ধ্যাবসানে ধ্রুবকে খাওয়াইলেন; ক্রমে রাত্রি অগ্রসর, ধ্রুব আজকার মত জননীর অমৃতময় ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। পুত্রধনে বক্ষে ধরিয়া সুনীতি অবিলম্বে নিদ্রায় অভিভূত। ধ্রুবের নিদ্রা নাই, প্রাণ নিতান্ত পরবশ, পাছে জননী জাগরিত হন, এই জন্য যথা সাধ্য স্থির হইয়া রহিলেন। মনে মনে আশ্রয়দাতার শরণাপন্ন হইলেন, হৃদয়াবদ্ধপুটে সুধাময় নামগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন, উদ্বেগ-মাঝে কেমন এক শান্তি আসিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত করিল। নামামৃত-পানে খিন্নহৃদয় অল্পে অল্পে সজীব হইয়া উঠিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, ধ্রুব সাবধানে উঠিয়া মস্তকে জননীর চরণ স্পর্শ করিলেন, প্রসুপ্ত মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, হায়! তৎক্ষণাৎ চক্ষে জল দেখা দিল, আর বিলম্ব না করিয়া সত্বরপদে নিম্নাভিমুখে চলিলেন। দাসীরা নিদ্রায় অচেতন, নির্ব্বিরোধে বাহির অলিন্দে পৌঁছিলেন। বহির্দ্বারে ত প্রহরী সজাগ! মন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হায়! অন্তঃকরণ! কেন বিধাতা তোমায় এমন অদ্ভুত চকিতবিস্ফার-শক্তি দিয়া ক্ষুদ্র মনুষ্য শরীরে স্থান দিয়াছেন! অগ্নিচূর্ণ তোমার নিকট শতবার

পরাস্ত হয়। ধন্য হৃৎপিণ্ড তোমায় ধারণ করে, সে হৃদয় সহস্র-বার ধন্য যে তোমাকেও অবলীলাক্রমে সংযত করে।

অচিরে নিরুপায়ে উপায় মিলিয়া গেল। কিছু দূরে একটী মলিনবসনা রমণী জাগরিতা। দেখিবামাত্র ধ্রুব চমকিয়া উঠি-লেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই অপূর্ব্ব আশ্বাস হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ধীরে নিকটে গিয়া স্বভাব-কোমল স্বরে বলিলেন, ভিখারিণি! তুমি জাগিয়াছ

উঃ—হাঁ বাপ্! উঠিয়াছি, তুমি ধন এখন এখানে কেন?

ধ্রু—হাঁ, আসিয়াছি, তুমি এখন যাইবে?

উঃ—হাঁ বাপ! অনেক দূর যাইতে হইবে!

ধ্রু—তুমি একটী কায করিবে?

উঃ—কি বাপ! তোমার কাজ করিব না!

ধ্রু—আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে?

উঃ—সে কি ধন! তুমি এত রাত্রে কোথায় যাইবে?

ধ্রু—না, বাহিরে যাইব, তোমার কিছু ভয় নাই। তোমার ছেলেকে এই গায়ের কাপড় খানি দিব। ভিখারিণী ইতস্তত করিতেছিল, ধ্রুবের বিলম্ব সহেনা, তাহার পুত্রের কক্ষে মূল্য-বান্ বস্ত্রখানি দিয়া, তাহার মলিন শয্যাবস্ত্রে আপাদমস্তক সত্বর আবৃত করিয়া বলিলেন—চল। সে অগত্যা তথাস্তু করিল। হায়! ভিখারিণী বড় কুকার্য্য করিলে! অথবা তোমার দোষ নাই, দারিদ্র্যের বা ভবিতব্যতারই দোষ।

একপার্শ্বে ভিখারিণি, অন্যপার্শ্বে বালক দুইটী, তিন জন যখন দ্বারের নিকটস্থ হইল, তখন দ্বারবান্ পার্শ্বস্থ প্রহরিগৃহে বসিয়াছিল; প্রশ্ন হইল কে যায়

উঃ—বাবা! আমি ভিখারিণী, সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিলাম।

প্রঃ—এদিকে এস। ভিখারিণীর আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। ধ্রুব অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—তুমিই যাও। অনেক সাহসে সে একাকিনী প্রহরীর নিকটস্থ হইল। প্রহরী সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এত রাত্রে কোথায় যাইবে?

উঃ—বাবা! অনেকদূর যাইতে হইবে, দুঃখীর কি রাত দিন বাছিলে চলে!

প্রঃ—হাঁ, ও দুটী তোমার ছেলে!

উঃ—হাঁ বাবা!

প্রঃ—(ভাবিয়া)—তুমি না একটী ছেলে লইয়া আসিয়াছিলে? কম্পিতস্বরে উত্তর—না বাবা! তোমাদের আশীর্ব্বাদে কাঙ্গালের এই দুটী রতন!

তখনকার লোক মানুষচুরির বিশেষ প্রয়োজন দেখিল না। বিশেষতঃ দয়াবতী সুনীতির আলয়ে কত দীন দুঃখী নিরাশ্রয় আসে, কত যায়, তাহাদের প্রতি উগ্রব্যবহার করিলে মাতা বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। সদয় প্রহরী একটু ভাবিয়া রায় দিল—আচ্ছা যাও। ভিখারিণীর মাথাহইতে যেন দারুণ ভার নামিল। নিতান্ত সাবধানেও সে একটু দ্রুতপদ হইয়া, ছেলেতটীর সহিত দ্বারের বাহির হইয়া ত্রস্তে চলিল; মনে মনে সঙ্কল্প করিল এমন কুকর্ম্ম আর প্রাণান্তেও করিবে না। একটু অগ্রসর হইয়াই ধ্রুব 'তবে তোমরা যাও' বলিয়া সত্বর অদর্শন হইলেন।

প্রত্যূষে পুত্রহারা হইয়া সুনীতি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দাস দাসী ভয়ে দুঃখে ত্রস্ত। সংবাদ শীঘ্রই রাজার নিকট পৌছিল, উত্তানপাদ ক্ষোভে অধোবদন। সারাদিন নগরেই

ওতপ্রোতভাবে অন্বেষণ চলিল ; কে জানে দুধের বালক বনে যাইবে ? রাত্রে ভিখারিণী ধৃত হইয়া আনীত হইল, ধ্রুব তাহার সঙ্গে নাই। সে বলিল,—ধ্রুব বাহির হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, গায়ের কাপড়খানি তাহার ছেলের গায়ে ফেলিয়া দেওয়ায় সে লইয়াছে, দোহাই ধর্ম্মের সে আর কিছুই জানে না। রাত্রে রাজভবনে নিদ্রা নাই। কিন্তু পরদিন ক্রমে গোল মিটিয়া আসিল, কোনও কারণে উত্তানপাদ অনুসন্ধান স্থগিত করিলেন, সুনীতিও কোনরূপে আশা ও জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পল্লব।

এদিকে ধ্রুব দ্রুতপদে যমুনাতীরে পৌছিয়া, তীরপথে রাত্রি থাকিতে থাকিতেই নগর ও গ্রামসীমা অতিক্রম করিলেন। বিনা উত্তরীয়ে থাকিতে নাই মাতার মুখে শুনাছিল,—কি হইবে ?—পরিধান বস্ত্রখানির কিয়দংশ ছিঁড়িয়া উত্তরীয় করিয়া প্রভাতের পাখীটীর ন্যায় বালক বহুপথ পশ্চাতে করিল। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল, অবিশ্রান্ত চলিতেছেন। সেপথে মধ্যে মধ্যে কেবল নৌকার গুণবাহিগণ যায় মাত্র, এখনকার উন্নতোন্নত নগরমালা তখনও মস্তক তুলে নাই, স্বাধীনপ্রায়া প্রকৃতিই সহচারিণী, কাহারও সহিত বড় একটা দেখা হইল না। ক্রমে মধ্যাহ্ন, সূর্য্যদেবের দয়ামায়া নাই, তবে শিশুপ্রিয়া যমুনা স্নিগ্ধহিল্লোলে অনেক স্নেহ দেখাইলেন, বহুতর তীরতরু ছায়া-দানে প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিল, এবং অনেকগুলি কলনাদি-

বিহঙ্গ বাক্যামৃত-বিতরণে খিন্নহৃদয়ের আশীর্ব্বাদ লাভ-করিল। আহার কিছুই নাই, যমুনার নির্ম্মল জলমাত্র সর্ব্বস্ব, অঞ্জলি পাতিলেই তিনি পরিপূরণে প্রস্তুত, এপথে পদার্পণ করিয়াই ধ্রুবকে ভিক্ষাঞ্জলি শিখিতে হইল, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? কণ্ঠ শুষ্ক হইতেই লাগিল। পথের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন, একস্থানে কয়েকটী রাখালবালক গরু চরাইতেছিল; নিকটে গিয়া ধ্রুব সাস্বরে কিছু দুধ চাহিলেন। তাহারা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া নির্ব্বিবাদে পত্রপুটে ধরিয়া প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিল। হায়! পুণ্যময়ী ধেনুর বাৎসল্যদর্শনে হৃদয়ে জননীর আনন বিদ্যুৎ-প্রকাশে আসিয়া পড়িল, অমনি মহাপ্রাণ বালক সত্বরে অভীষ্ট-দেবের পানে চাহিলেন। যমুনাজলে আচমন করিয়া নাম জপিতে জপিতে আবার সুস্থমনে অগ্রসর হইলেন। নয়নের বহির্ভূত হইলে রাখালগণ মুখ-চাহাচাহি করিল, রাত্রে জননীর নিকট গল্প হইল,—একটী দেববালক কপিলাদুগ্ধ পান করিতে আসিয়াছিল, 'দেখিতে কেমন মা! আমাদের কিন্তু ভয় দেখায় নাই।'

ক্রমে দিবসের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবের গতিও ক্ষীণ হইয়া আসিল, এক স্থানে রুদ্ধপ্রায়। যমুনার পার্শ্বে একটী অনতিবৃহৎ হ্রদ, দক্ষিণে অনুচ্চ প্রস্তরময় ভূমি, আর অতিক্রমে সামর্থ্য নাই। সন্ধ্যাও উপস্থিত, দিবাপতি নিরুপায় বালককে আঁধারে ফেলি-য়াই প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। সুকুমার অঙ্গ আর কত সহিবে? ধ্রুব উপবেশন করিলেন। হায়! হ্রদটী পার হইতে পারিলেই বোধ হয় অভীষ্ট স্থানে পৌছান যাইত, ধ্রুব সেইরূপই শুনিয়া-ছিলেন, এবং সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার দৃষ্টিপাতও করিতে লাগি-

লেন, কিন্তু কই? পার ত নিকটে আসিল না। যমুনা কলকলে আশ্বাস প্রদান করিলেন। পারে কমলবনও নিদ্রার আয়োজন করিতেছেল, তাহারাও মধুকণাহস্তে সমীরণকে প্রেরণ করিয়া প্রণয়াগত শ্রান্ত মিত্রের যথাসাধ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি করিল না। ধ্রুবের নয়নকমলও নিমীলিত হইয়া আসিল, তীরভূমির কোলে শয়ন-করিলেন। দয়াবতী নিদ্রা অবিলম্বে সর্ব্বাঙ্গে সুধাময় হাত বুলাইয়া বালকের সংজ্ঞা হরণ করিলেন।

কাল এখনও ধ্রুবতারাটী জননীর হৃদয়াকাশ উজ্জল করিতে ছিল, আজ কালচক্রে বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীতীরে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। গতরাত্রে জননীর ক্রোড়ে মহার্ঘ শয্যাতেও ধ্রুবের কিছুতেই স্বাস্থ্য বোধ হয় নাই, আজ নদীকোলে ধূলিশয়নেও পরম স্বাস্থ্য অনুভব হইতেছে। কারণ কি? ক্লান্তি একটা স্পষ্টই কারণ বটে; কিন্তু শুধু তাহাই নহে। কাল হৃদয়ের শয্যা ছিলনা; হৃদয় শান্তিশয্যায় শয়ান না হইলে বাহ্য শয্যা পরাস্ত হয়। জননী কাছে না থাকিলে অপর বালকেরাও সুশয্যাতেই বা ঘুমায় কই? আজ ধ্রুবের হৃদয়ে আশাই শয্যার কাজ করিতেছে। কল্যকার সে উদ্বেগের আঘাত নাই, কেবল মৃদু মৃদু বিকম্পন এখনও রহিয়াছে। ললাটে নিদ্রাহস্তের অমৃতবিন্দু অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে ও সমীরণের পরিচর্য্যায় অন্তর্হিত হইতেছে। ক্রমে হৃদয় সুস্থির হইয়া আসিল, শান্তির পূর্ণতায় একটী উচ্ছ্বাসের সহিত বহির্গত হইয়া শ্রান্তি আপাতত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

যমুনাতীরে ধ্রুব নিদ্রায় অচেতন, প্রকৃতিও অচেতন। হঠাৎ দেখিলে কি বোধ হয়? কোন দুরন্ত চোর কি কাহারও এক-

খানি সোণার প্রতিমা চুরি করিয়া আনিয়াছে? তবে এখানে কেন? হয়ত শেষে ভীত হইয়া হতভাগ্য এই জনশূন্য স্থানেই ফেলিয়া গিয়াছে। হায়! যাহার ধন সে জানিল না, সন্ধান করিতে পারিল না, হয়ত তাহার পূজার সাধ ফুরাইল! মানুষে সন্ধান পাইল না বটে, কিন্তু যমুনা কি করেন? তাঁহার সন্ধানে ফল কি? সংসারের ধনরত্ন সাগরে নিক্ষেপ করাই তাঁহার কায, তবে আর তিনি মানুষের কত মুখ চাহিবেন? কয়েকটী কল-হংস একবার হঠাৎ কোলাহল করিয়া উঠিল, তাহারা বুঝি কিছু সন্ধান পাইয়াছে। কতক্ষণে শশাঙ্কদেব ধীরে ধীরে পূরবে দেখা দিলেন, তিনি অবশ্যই সন্ধান পাইয়াছেন। একে একে অন্ধকার আবরণ নিঃশেষ করিয়া নিশানাথ মধ্যগগনে আসিয়া বিস্ফারিতনেত্রে অধোদৃষ্টি করিলেন। আর যেন চলিতে চাহেন না। অজস্র প্রেম-ধারা-বর্ষণে জগৎ পরিপ্লাবিত করিতে লাগি-লেন। যমুনার তীর নীর একাকার হইয়া উঠিল।

উপরে উদার কান্তি শরতের চন্দ্র, নিম্নে একটী বিকীর্ণকান্তি প্রতিবিম্ব, তীরে অদীনকান্তি ধ্রুব, মধ্যে ঘনীভূত জ্যোৎস্না-রাশি; কেমন দেখাইতেছে? ক্ষীরসমুদ্রে চাঁদের জন্ম, এক-খানি তরুণ চাঁদ উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে, আর দুইটী শিশুচাঁদ নিম্নে ডুবিয়াই রহিয়াছে। হায়! একটী যাহার হৃদয়ের প্রকৃতই চাঁদ সে এখন কোথায়!

কতক্ষণ চলিয়া গেল, মানবের দেখা নাই। দূরে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দেখা দিল। সেই দিকেই আসিতেছে, ক্রমে নিকট-বর্ত্তী হইল, বাহকগণ শ্রান্ত, সেইখানেই বিশ্রাম করিবে। হ্রদ-মুখে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তরণী উত্তর তীরে

লাগিল। মুখে জল দিয়া বাহকগণ নিশ্বাস ফেলিল। অনেক রাত্রি হইয়াছে, হুতাশনের পূজার অবকাশ হয় নাই, দুই চারটি নিশ্বাস ফেলিয়াই সকলে যথাবিধি আহুতির আয়োজন করিল। পূজান্তে নিশ্চিন্ত হইয়া অচিরে দারিদ্র্যের কোলে অঙ্গবিস্তার করিল। শ্রম দীর্ঘ, অল্প বিশ্রাম পর্য্যাপ্ত, দারিদ্র্যের এইটী অমূল্য প্রসাদ। সাবধান কর্ণধার তৃতীয় প্রহরেই জাগরিত হইয়া সহযোগীদের কর্ণ আকুল করিতে লাগিল। ক্রমে সকলেই উঠিয়া অবশ চক্ষের সান্ত্বনে নিযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া, নাবিক নামিয়া মুখপ্রক্ষালনাদি সমাপন করিল। একটু ইতস্তত করিতেছে, হঠাৎ নিদ্রিত ধ্রুবের অঙ্গে দৃষ্টি পড়িল। জ্যোৎস্নায় গৌরানন ধপ্ ধপ্ করিতেছে। চমকিয়া নিকটে গেল; মুখখানি বেশ সজীব; সাহসে হস্ত নিকটে লইয়া দেখিল, স্পষ্ট নিশ্বাস পড়িতেছে। ব্যাপার কি! যা হউক স্পর্শ করা হইবে না! সঙ্গিগণে ডাকিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বড় বিলম্ব হইল না। হ্রদের গায়েই যে বন, তাহার নাম মধুবন, তথায় মানুষে যায় না, শুনিয়াছে অদ্ভুত জন্তু আছে। কত নাবিক তথায় সিদ্ধ পুরুষ দেখিয়াছে। ছেলেটী কোন সিদ্ধেরই সন্তান, কেমনযন্ত্রে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে; শীঘ্র পলায়নই শ্রেয়। সিদ্ধান্ত এইই বটে, 'কিন্তু যদি তা নাই হয়, তবেতো ও ছেলেটী? মারা যাইবে!' আহা! অকারণ শিশুস্নেহ এমনই হৃদয় টানে। 'কিন্তু সিদ্ধগণ দেখিলে কি আর নিস্তার আছে! না, নিজের প্রাণ সাবধানই ভাল, নৌকায় চল। কি আশ্চর্য্য! ছেলেটী হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া চখ চাহিল যে! আর পলাইবার সময় নাই, চুপ্ চুপ্!'

ধ্রুব স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন তিনি বনের মধ্যে গিয়াছেন, বনটী গৃহ অপেক্ষাও সুন্দর,—গম্ভীর, স্নিগ্ধ। আশার সেই দেবতা দেখা দিতে দিতেও দিতেছেন না। হঠাৎ যেন তাঁহার কথা শুনিলেন, লোমাঞ্চ হইতেছে। দুই একবার উৎকণ্ঠার পরেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। আঁখি সত্বর মেলিলেন, সম্মুখে কয়েকটী লোক। তেমন লোক অনেক দেখিয়াছেন বটে, কথা কহিলেন না। পরক্ষণে আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিলেন। নাবিকগণ স্তম্ভিতপ্রায়, কর্ণধার জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুর আপনি কে?' ধ্রুবের আবেশ এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই, মৃদুস্বরে বলিলেন 'তোমরা কে?' উত্তর—'আমরা নাবিক।' ধ্রুব কিছু বিষণ্ণ হইলেন; একটু ভাবিয়া বলিলেন আমাকে পার করিয়া দেও, তোমরা হ্রদের পারে যাইবে? তাহারা তথায় কদাচই যাইত না, কিন্তু ধ্রুবের কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া চলিল। মধ্যে মৃদু মৃদু দুচারিটী কথাবার্ত্তা হইল। ফলে তাহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের কোন ভুল নাই। হ্রদপারে সিদ্ধ শিশুকে নামাইয়া দিয়া, সকলে প্রণাম করিয়া, ত্বরায় যমুনা পার হইয়া অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পল্লব।

এখনও রাত্রি শেষ হয় নাই; স্বপ্নপরীক্ষার প্রবল ইচ্ছায় ধ্রুব বনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। স্বপ্ন সত্য হইল না; স্বপ্নের সেই কুহকময় বনটী আর জাগরণে দেখা দিল না। তবে রমণীয়তা প্রায় সেইরূপ হৃদয়স্পর্শী বলিয়াই সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইল। দক্ষিণে হ্রদতীর ঝর ঝর করিতেছে, তৎপরে অনেকদূর অল্পই জল, কেননা একটী বিস্তীর্ণ কমলবন দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি শতদল ছোট বড় মিশিয়া উন্নতানতমুখে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বামে নীল বনরাজী এখনও প্রসুপ্ত, নানাবিধ ছোট বড় গাছ গায়ে গা দিয়া নিস্পন্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাছের সার সমুদ্রের ন্যায় কতদূর চলিয়া গিয়াছে। বনতলে কোন তৃণগুল্মাদি নাই, শুষ্ক পাতাগুলি এক এক দিকে সরিয়া রহিয়াছে। উপরে শ্যামল পাতায় এখনও জ্যোৎস্না গড়াইতেছে।

ধ্রুব মধ্যে প্রবেশে অতি উৎসুক, চন্দ্রালোকে বৃক্ষমালার অন্তরালে অগ্রসর হইলেন। শ্যামাঙ্গী নিষাদসুন্দরী বনভূমি ঘুমাইয়াছে, একটী স্বর্ণকান্তি বালক নিজ মনে তাহার অঞ্চলে আশ্রয় লইল, জাগরণে সে তাহাকে কোলে পাইবে, এদৃশ্য মন্দ নহে। সেও বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

মধ্যে আলোকের বড় প্রবেশ নাই, ধ্রুবের অধিকদূর যাওয়া ঘটিল না। অনুচিত শ্রমে পাদুখানিও ভার ভার, একটী বটবৃক্ষ দেখিয়া তাহার মূলে বসিলেন; বসিয়া বীরশিশু আবার কর্ত্তব্যচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন।

আমরা বারম্বার ধ্রুবমহাশয়কে বীরসম্মানে সমাদৃত করিয়া প্রায় পুনরুক্তি দোষে দূষিত হইয়া পড়িতেছি, সুতরাং বালকের বীরত্ব-প্রতিপাদক দুইচারিটী কথা বলার প্রয়োজন। বীরত্বপদার্থটী কি? কোথায় অনুসন্ধান করা যায়? ভার্গবের অপ্রতিহত অস্ত্র, দাশরথির অক্ষোভ হৃদয়,ভীষ্মদেবের অব্যর্থ প্রতিজ্ঞা, ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত অস্ত্রকৌশল প্রভৃতি বীরত্বের পরিচয় আমরা পুরাণমুখে শুনি বটে। কিন্তু এক পুরাণকথার সমর্থনে অন্য পুরাণ দৃষ্টান্ত তুলা ভাল দেখায় না; প্রাচীন কথা আর জীবন্ত আদর প্রাপ্ত হয় না।

তবে সেদিনকার প্রত্যক্ষতুল্য পাশ্চাত্য ক্ষেত্রসমূহেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। তথায় কি দেখা যায়? বিস্তারিতবিধানে তথায় ব্যাপারের অন্ত নাই। চরণে এক রণক্ষেত্র, হস্তে একখানি রণক্ষেত্র, আবার নয়নেও একটী রণক্ষেত্র। এই লোক নিজের পায়ে চলিতেছে, পরক্ষণেই অন্যের চরণে দৌড়িতেছে। নিজ হস্তে সন্ধানের বড় অবকাশ নাই। কখন বা হস্তপদ বর্ত্তমানেও কত লোক হস্তপদশূন্য। আবার কত লোক শত-যোজন দূরে বসিয়াও উৎসুকচিত্তে সমুদায় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছে। এইরূপ বিবিধ বৈচিত্র্য বর্ণনার অসাধ্য। স্থূলত দৃষ্টিপাত করিলে, কেবল অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্রের বিভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ও অপরিমিত সদ্যোমাংসের দারুণ পরিণাম সম্মুখে বিস্ফারিত দেখা যায়। এই সব অদ্ভুত বিজাতীয় যন্ত্র ষড়যন্ত্র সকলই বীরত্বের উপকরণ বটে, ইহার মধ্য হইতে বীরত্ব টুকু সাবধানে বাছিয়া লইতে হইবে, তাহার চেষ্টা করা যাউক।

কিন্তু বীরত্ব যে ইতিমধ্যেই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন

এমনও নহে। অন্ধকার জ্বালিয়া ঘোর উল্কাপাতে লক্ষ লক্ষ নরবক্ষ চূর্ণ করিলে, অথবা তীক্ষ্ণ ভল্লে রাশি রাশি ভ্রাতৃশির বিচ্ছিন্ন করিলেই যে অক্ষয় বীরপদ লাভ হয়, একথাও বলা যায় না। প্রশস্ততর ক্ষেত্রও আছে, তাহাও পরিদর্শন করা বিধেয়।

প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, হিংসাশক্তি আদৌ বীরত্বের আধার নহে, রক্ষাশক্তিই বীরত্বের জননী। মনুষ্যের যাহা গৌরব, মানব হৃদয়ের যাহা অস্তিত্ব, যাহা থাকিলেই মনুষ্যকে হৃদয়বান্ বলা যায়, মনুষ্যজগতের এই সাধারণ পরমার্থ পদার্থটীর রক্ষাবিধানে যিনি যতদূর সমর্থ, তিনিই ততদূর বীরত্বে অগ্রসর। আপনার প্রতিই হউক, আপন আত্মীয়ের প্রতিই হউক, আর স্বদেশীয় বিদেশীয় যে কোন নরনারীর প্রতিই হউক, অত্যাচার যাহার প্রাণ সহ্য করিতে চাহে না, প্রাণ হস্তে করিয়া যিনি এই নরত্বনাশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্রসর, তিনিই সংসারে বীরপথের পথিক। এই নশ্বর নরধামে যে কয়টী ভ্রাতৃজীব প্রাণেপ্রাণে আছে, সেই কয়টীর হিতাভিলাষই যাহার মুখ্য সেনানী, তাদৃশ সেনাদলই বীর সেনাদল।

এখন কি উপায়ে এই বিশ্বজনীন মর্য্যাদা, পৃথিবীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা হয়? অস্ত্র এক উপায়। কিন্তু অস্ত্রে এক অঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য অঙ্গ রাখিতে হয়, সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা হয় কই? হয় না সত্য, কিন্তু দুষ্টাঙ্গের যাতনায় অস্থির হইলে ছেদবিধি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, আর সুস্থতার বিলম্ব সহেনা, অস্ত্রাঘাতের ক্ষণিক যন্ত্রণা শ্রেয়স্কর বলিয়াই বোধ হয়। এই অপরিহার্য্য অবস্থায় যিনি অস্ত্র ধারণ করেন্ তাঁহাকেই অস্ত্রবীর বলা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অন্যায় অত্যাচারে একান্ত বিতৃষ্ণা ও দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার প্রবল ইচ্ছাই শস্ত্রক্ষেত্রে বীরত্বের মূল। এ উভয়ই আমাদের ধ্রুবের ক্ষুদ্রহৃদয়ে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে। পিতার ও বিমাতার অপমানবিন্দু তথায় দারুণ অভিমানাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল, মাতার দুঃখ মর্ম্মবিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ঈদৃশ বীর্য্যাগ্নি লইয়া তিনি কোন ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন? ক্ষত্রিয়সন্তান নৃমুণ্ড-মালিনী অসিজিহ্বার আয়তন কি জন্য বিস্মৃত হইলেন? হায়! রক্তে কলঙ্কিত অসি ধারণ করিলে কে তাঁহাকে বীরপদে বরণ করিত? ভারতে পিতৃদ্রোহী হইলে কে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিত? সে পথে তাঁহার হৃদয় ভ্রমেও পদার্পণ করিল না। স্বভাবত নিষ্কলঙ্ক প্রাণ অন্ত না জানিয়াও নিষ্কলঙ্ক পথেরই অন্বেষণ করিল।

লক্ষ্যচ্যুত না হইলে উল্লিখিত পন্থাও বীরপথ বটে। কিন্তু এ শোণিতাক্ত পথে পদার্পণে অনেকে একান্ত বীতশ্রদ্ধ। আংশিক অসিদ্ধ উপায়ে কি সজীব চিত্ত পরিতৃপ্তি বোধ করিতে পারে? বীভৎস প্রেতভূমির আধিপত্যে কি হৃদয়বান্ হৃদয় চরিতার্থম্মন্য হইতে পারে? তবে কি হইবে? অন্য উপায় দেখিতে হইবে, কোন নিরাময় সাধুপথের অন্বেষণ করিতেই হইবে। অধ্যবসায় মন্দ নহে, কিন্তু সাবধান, সে পথ অতি দুরূহ, জ্ঞানাসি বড়ই দুর্লভ, ধর্ম্মক্ষেত্র বড়ই দুরারোহ। জয়-পতাকা সহজে উঠিবে না, যশঃসমীর অকালে বহিবে না। কত মহারথীর শক্তি পর্য্যস্ত, কত পুরাক্রান্ত বীর পরাহত।

কদাচিৎ কোন অসীম শক্তিধর অনন্ত উৎসাহে এ অনন্ত

পথে দেখা দেন। প্রকাণ্ড প্রকৃতি মার মার করিতে থাকে, বীরবর অস্খলিতপদে কলহের কেন্দ্রভূমির অনুসন্ধান করেন, রোগের মূলোদ্ঘাটনে অগ্রসর হন। কিন্তু মূল কোথায়? সংসার-রোগের কি মূল আছে? তাহা কে বলিবে? যে বিহিতবিধানে অনুসন্ধান করিয়াছে সেই জানে। ফলে আমাদের ধ্রুব ব্যাপার না বুঝিয়াও এই দারুণ ক্ষেত্রেই পদার্পণ করিয়াছেন, তাই আমরা তাঁহাকে এই গরিষ্ঠ পদ্ধতির বীরশ্রেণীতে নিবিষ্ট করিতে ইচ্ছুক। পদ্ধতি যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ হইবার কথা নাই। কিন্তু হায়! এ পর্য্যন্ত মানব এ পথে অভীষ্টভূমে পঁহুছিল কিনা, নশ্বর নর অমৃতলাভে সমর্থ হইল কিনা, বুঝিবার সাধ্য কই? অথবা অমৃত সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইবার নহে, তাহা হইলেত মর্ত্ত্যধাম অমরাবতীই হইত। যাহা হউক, পথে পান্থশালা নাই এমনও নহে, বিধিমতে অগ্রসর হইতে পারিলে, বোধ হয় নিরাপদ আশ্রয়ও মিলে। বালক পথিক এতাদৃশ একটী অবান্তর বিশ্রামধামে উপনীত হইলেও আমরা সন্তুষ্ট হইব।

সপ্তম পল্লব।

বনমাঝে একটী বৃহৎ বটের মূলে ধ্রুব বসিয়া আছেন। মন কিছু শান্ত হইয়াছে, যাইব যাইব বলিয়া আর উদ্বিগ্নভাব নাই। পুণ্যতীর্থে তাঁহার চিত্তপ্রসাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। বনটী কিছুই দেখা হয় নাই, অথচ যেন কত পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রভুকে সন্নিহিত মনে করিতেছেন, উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে, নয়ন দর্শনে চঞ্চল, হেনকালে উষাদেবী হাঁসিতে হাঁসিতে বনে পঁহুছিলেন। শাখাসুপ্ত দুই একটী বিহঙ্গ অস্ফুট সঙ্গীত আরম্ভ করিতে না করিতে, ধ্রুবের ভাবিসখা কমলবনবাসী হংসগুলি স্ফুটস্বরে দেবীর সম্বর্দ্ধনা করিল। ক্রমে তরুরাজি প্রভাতিসঙ্গীতে আকুল; শ্যামল পাতার অন্তর হইতে যেন সর্ব্বত্র সুধাধারা ঝরিতে লাগিল। 'চিচীকুচী' কুহুপিহু রবসহস্রে স্বভাবের প্রিয়স্থলী যেন একটী অদ্ভুত গীতিযন্ত্রালয়। মৃদু মৃদু সমীরে শাখাগ্রগুলি চলিতে লাগিল, বনকামিনী যেন স্বপ্নদৃষ্ট ধ্রুবধনে বক্ষে দেখিয়া প্রমোদে নৃত্য আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল মনোদুঃখ ভুলিয়া ধ্রুব পুলকে নিশ্চল।

ধ্রুবের আগমনে বন উৎসবময়, চতুর্দ্দিক উৎসবময়, এ কথা যদি হৃদয় কল্পনাপক্ষেই নিক্ষেপ করিতে চাহে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ধ্রুব ঋষিসেবিত তীর্থবনে উপস্থিত, তায় আবার পুণ্যময় প্রভাতকালে। আর যদি কল্পনাই মানিয়া লওয়া যায়, তথাপি কি ইহা নিঃসার অমূলক কল্পনাই হইবে? অনন্ত গ্রহনক্ষত্র যে বনের বৃক্ষ, সেই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডবনের যিনি স্বামী, তাঁহার প্রিয়সন্তানে সমাগত দেখিয়া এই একটী

তৃণবন ক্ষণকাল আনন্দিত হইবে, এইটুকুও যদি আশা না করা যায়, তবে আর এ জগতের মর্য্যাদা থাকে কই ? আমাদের সমাগমে বন কঠোর গম্ভীর ভাব ধারণ করে সত্য, কিন্তু সাধুর পদস্পর্শেও যে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর প্রাপ্ত হইবে না এ বিষয়ে নিশ্চয় কি ? আর তাহা হইলে যে এ তৃণাধম সাধু-বৎসলের ভ্রূভঙ্গে নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না তাহাতেই বা বিশ্বাস কি ? তাই মানিলাম ধ্রুবের আগমনে বন সম্প্রতি উৎসবময়। উষার আশীর্ব্বাদে ধ্রুব ধীরপ্রসন্নভাবে বটমূলে বসিয়া আছেন, এদিক ওদিক দেখিতেছেন, এক একবার ইষ্টলাভের আশায় মন ব্যগ্র হইতেছে, কর্ত্তব্যচিন্তা করিতেছেন। বনে যে হিংস্র জন্তু আছে এ চিন্তা তাঁহার অন্তরে কিছুতেই আসিতেছে না। সে রাজ্যের সকলকেই "প্রভুর পারিষদ বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে; কল্পনা সমস্ত পশুকেই বিশুদ্ধ প্রেমময় মূর্ত্তি বিলাইতেছে। নিম্নে কোন শব্দ হইলে, কোথাও তরুলতা নড়িলে, সতৃষ্ণ দৃষ্টি কেবল প্রিয়বস্তু দেখিবার আশাতেই দৌড়িতেছে, কিন্তু আশাপূর্ণ হইতেছে না। এক আধবার কোন পশুরই সাড়া পাওয়া গেল বটে, একবার কি যেন দৌড়িয়া গেল, কিন্তু নিকটে আসিল না। অন্ধকার ছাড়িতেছে, বনগর্ভ সুস্পষ্ট হইতেছে, যতদূর দেখা যায়, আর কিছু নহে, কেবল তরুলতা ঝর ঝর করিতেছে।

ক্রমে উষা অন্তর্ধানের উপক্রম করিলেন। বিহঙ্গগণ ইতস্ততঃ প্রস্থান করিল। আবার বন নীরবপ্রায়, কাহারও সাক্ষাৎ নাই, কেবল মাঝে মাঝে অরুণালোক ফাঁক দেখিতেছে, কোথাও বা যেন ঝর ঝর বরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। শাখা-

গুলি রহিয়া রহিয়া মাথা দোলাইতেছে, ধ্রুবের মন আবার উদাস করিতেছে।

ধ্রুব অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না, উৎকণ্ঠার প্রবল পীড়নায় বটমূল ছাড়িয়া উঠিলেন, এবং হ্রদতীর অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেন। সে পথে অধিকদূর যাওয়া হইল না, অনতিদূরেই নিবিড় বনবেতসে তীরভূমি অগম্য হইয়া গিয়াছে। বামে ফিরিয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন। বন ক্রমেই গাঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে উন্নতানত প্রস্তরমালা সদ্যোধৌতবৎ দেখা যাইতেছে। ধ্রুব ক্লান্তিসত্বেও দুই একটীর উপর আরোহণ করিলেন। পরিষ্কৃত ভূমিসজ্জাদর্শনে তাঁহার প্রবল আশ্বাস জন্মিল অবশ্যই এখানে কোন বনবাসী আছেন। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জনমানবের উদ্দেশ্য পাইলেন না। শরীর অবসন্নপ্রায়, চরণ আর কিছুতেই চলে না, ক্রমে হৃদয়ে নৈরাশ্যের ছায়া দেখা দিল, প্রাণ আকুঞ্চিত হইয়া আসিল, আশুষ্ক মুখমণ্ডল কাতরশ্রী ধারণ করিল। হায়! কুহকিনী আশা! ধ্রুব তথাপি মনে ভাবিলেন হয়ত ডাকিলে কাহারও সাড়া পাইতে পারি। যথাসাধ্য উচ্চস্বরে ডাকিলেন—'এ বনে কে আছেন? আমি বালক, অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, বড় কষ্ট হইয়াছে, আমায় একবার দেখা দিন।' কাহারও উত্তর নাই, প্রতিধ্বনি অস্ফুটে বলিল 'দেখা দিন'। ধ্রুব কিছুই বুঝিলেন না। আবার ডাকিলেন—'বনে ব্রাহ্মণ সদাশয় কে আছেন, আমায় পিতা ত্যাগ করিয়াছেন, অনেক কষ্টে আপনাদের আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমায় শীঘ্র দেখা দিয়া

রক্ষা করুন।' আবার সেই অস্ফুট প্রতিধ্বনির পরক্ষণে গম্ভীর বনগহন নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ধ্রুব ছল ছল নেত্রে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কোথাও কেহ নাই। হায়! বালকের যথার্থই অরণ্যে রোদন হইল।

বিশাল অরণ্যানী নিস্তব্ধ, তরুলতা নিস্পন্দে দণ্ডায়মান,ধ্রুব ভগ্নহৃদয়ে কাতরকণ্ঠে এইবার শেষ ভরসায় ডাকিলেন—'আপনি কি আছেন? নারায়ণ, বিষ্ণু, বাসুদেব, ত্রিভুবনের ঈশ্বর, দয়াময় হরি! শীঘ্র না দেখা দিলে আমি বাঁচিব না, আমায় দয়া করিয়া দেখা দিন।'

রোদন সুদূর অরণ্যে মিলাইয়া গেল। গভীর মধুবন অবশ্যই সবিস্ময়ে সে হৃদয়স্পর্শী রোদন ধ্বনি শুনিল। তাহার আর সাধ্য কি? সেই এক গম্ভীর প্রতিধ্বনিমুখে বালকের হইয়া প্রার্থনা করিল—'দেখা দিন।' আর কে সে রোদন শুনিল? দুই একটী বিহঙ্গ শাখান্তরাল হইতে শুনিল, মস্তক হেলাইয়া হেলাইয়া কাতর মুখখানিও দেখিল; আর দুই একটী বনমৃগও দূর হইতে অবশ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু তাহাদেরই বা কোনও সামর্থ্য কোথায়? আরও কি কেহ শুনিল? কোন যোগী ঋষি, ব্রাহ্মণ বনচারী কি শুনিলেন? না, তাঁহারা শুনিলে কি আর থাকিতে পারিতেন? একটী বিহঙ্গের কাতরধ্বনিও যাঁহাদের মর্ম্মস্থলে আঘাত করে, মানবকণ্ঠের আর্ত্তস্বরে তাঁহারা অবশ্যই ত্বরায় আসিয়া পড়িতেন। তবে কি তীর্থবনে কোন তীর্থবাসীর সম্পর্কমাত্রই ছিলনা? তাহা স্থির বলা যাইতে পারে না; কিন্তু থাকিলেও কেহ যে সচেতন অবস্থায় ছিলেন একথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস

করিতে পারিলাম না। তবে আর কে? আর কেবল ধ্রুবের সেই আশ্বাস-মূলাধার সর্ব্বসাক্ষী পরম দেবতা। প্রাণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—তিনি কি শুনিলেন? তাহা এখন কিরূপে নিশ্চয় করা যাইতে পারে?

ক্ষীণকণ্ঠ, খিন্নপ্রাণ, অবশচরণ ধ্রুব আর অধিক আকিঞ্চনের সামর্থ্য ধরিলেন না। আর সে নিবিড় বনহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ক্ষীণ ক্ষীণ আশাবশেষটুকু লইয়া, কষ্টে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পুনরায় সেই বটমূলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অপাঙ্গে অশ্রুকণা দেখা দিল, হৃদয় অবসাদ-নীরে অবগাহনের উপক্রম করিল। কিন্তু যে জ্বলন্ত বীর্য্যবহ্নি হৃদয়ে ধরিয়া ধ্রুব এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা ইতি-মধ্যেই নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হয় নাই, এখনও সে বীর্য্যস্ফুলিঙ্গ জড়প্রায় হৃদয়ে মৃদু উত্তাপ পোষণ করিতেছিল। ধ্রুব আকুল হইয়াও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এ কেমন হইল? মা কি অলীক কথা বলিলেন? বনে কি জনমানব নাই? না, এমন হইবে না, আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি, মা বলিয়াছিলেন অধিক ব্যস্ত হইলে কার্য্য হয় না, আমাকে ধীর হইয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

এইরূপে মহাপ্রাণ বালক নিদ্রায়মাণ প্রাণকে আবার উন্নিদ্র করিতে সযত্ন হইলেন; স্থিরভাবে বসিয়া আবার কর্ত্তব্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। একটীর পর আর একটী বিকল্প ধরিয়া ধ্রুব উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন উপায়ই ত সাধ্যসীমায় পদার্পণ করিল না। অসাধ্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া

আবার ইতস্তত সমুৎসুক দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই নিষ্কম্প তরুলতা, সেই আরক্ত অরুণালোক, সেই নিস্তব্ধ বনস্থলী সেইরূপ মন উদাস করিতে লাগিল।

দূরে কেমন এক মধুর ঝঙ্কার শ্রুতিগোচর হইল। বিহঙ্গের গান নহে, তবে কি? ক্রমেই স্পষ্ট হইতেছে, যেন বীণার স্বরতরঙ্গ। ধ্রুব বীণা শুনিয়াছেন, এ তেমন নহে, এ বড় মধুর। নিকটেই ক্রমে আসিতেছে, আকাশ ভরিয়া স্বরস্রোত কলকল করিতেছে! বনে বীণা বাজায় কে? আমাদের পুরাণ কথকগণ বর্ণন করেন, ইন্দ্রদেব, পাছে ধ্রুব তপস্যায় ইন্দ্রত্বটুকু কাড়িয়া লয় এই ভয়ে, অতি সুবিবেচনার সহিত তাঁহার বিঘ্নার্থে কয়েকটী মত্তকাশিনী অপ্সরা পাঠাইয়া দেন। এ পুরাণে পূর্ব্বাহ্নেই সেই অভিনয় আরম্ভ হইল, মন্দ নয়। আহা, তা নহে, ঐ শুনুন, সঙ্গে অতি মধুর হরি হরি ধ্বনি হইতেছে, ছলনার গন্ধও নাই, সুস্পষ্ট পবিত্র কণ্ঠস্বর! ধ্রুব একেবারে হর্ষে বিস্ময়ে অভিভুত, হৃদয় জড়প্রায় হইয়া গেল। ক্রমে স্বরলহরী আকাশে বিলীন হইল। বীণাহস্তে ধীরে ধীরে আর একটী প্রবৃদ্ধ বালক আমাদের বালকের সম্মুখীন হইলেন।

ধ্রুবের অভ্যুত্থান মনে নাই, মুখে কথা নাই, নয়ন নিশ্চলপ্রায়। আগন্তুক নিকটস্থ হইলেন, তদবস্থ দেখিয়া প্রথমেই সম্ভাষণ করিলেন, বলিলেন-ধ্রুব! আমি তোমায় দেখিতে আসিলাম, তোমার কি ভয় হইয়াছে? যেন চমক ভাঙ্গিয়া ধ্রুব একেবারে দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন, আজ্ঞে না, কিছু ভয় হয় নাই, আপনি এত বিলম্ব করিলেন কেন? আহা প্রাচীন ঋষি একটু হাঁসিলেন, বলিলেন, ভাই ধ্রুব, তুমি যাঁহাকে মনে করিতেছ

আমি তিনি নই; তাঁহার আসিতে ত ভাই এখনও অনেক বিলম্ব আছে, তুমি এখনই এত ব্যস্ত হইয়াছ! ধ্রুব নিরুত্তর। ঋষি—যাহউক, আমি আসিয়াছি, তোমার সহিত কোন কথা আছে, কিন্তু তুমি এমন উদ্বিগ্ন হইলে কিরূপে হইবে? কথা গুলি বুঝিতে ধ্রুবের অল্প সময় লাগিল, একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'না, আমি আর ব্যস্ত হইব না, আপনি দয়া করিয়া বলুন কি করিতে হইবে!' ধ্রুবের বড় নৈরাশ্য আসিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, মা বলিয়াছেন, বনে অনেক সাধু মহাত্মা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারাই কর্ত্তব্যবিষয়ের উপদেশে পটু। মাতৃবাক্য এখন মনে প্রবল আশ্বাস প্রদান করিল। চরণলুণ্ঠিত হইয়া এতক্ষণে তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ শীঘ্রই উঠাইয়া বলিলেন, না ধ্রুব, শুধু প্রণাম করিলে হইবে না, বল দেখি তুমি যে বনে আসিলে, কত দিন এ বনে থাকিতে পারিবে? ধ্রুব আজ্ঞে কেন, আপনি যতদিন বলিবেন ততদিনই আমি থাকিতে পারি? ঋ—ও কি ভাই কাযের কথা, মনে কর যদি তোমায় দশ বৎসর থাকিতে হয়? ধ্রু—আজ্ঞে তা নিশ্চয়ই পারিব। ঋ—সে কি বনে কত কষ্ট জান? কোথায় শয়ন করিবে? কাহার কাছেই বা শয়ন করিবে? কেই বা ক্ষুধার সময খাওয়াইবে? নিজে ফল পাতা কুড়াইয়া খাইতে হইবে? ঋষির স্বরভঙ্গী শুনিয়া ধ্রুব একটু হাঁসিলেন, বলিলেন আপনি যাহা বলিবেন আমি সকলই করিতে পারিব। ঋ—না, তা বোধ হয় না; আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস দেখি, অনেক কথা আছে। বীণাটী সেইখানে রাখিয়া ঋষি অগ্রসর হইলেন, ধ্রুব অনুগামী।

আমরা যাঁহাকে প্রবুদ্ধ বালক বলিয়া উল্লেখ করিলাম, এই অবসরে তাঁহার আকার প্রকারের আভাস সংক্ষেপে দিতে পারি। এই মূর্ত্তিটী বিশুদ্ধ ভারতের চিত্র বলিয়াই বোধ হয়। সভ্যই হউক, অসভ্যই হউক, আর সভ্যাসভ্যতার মস্তকে জলাঞ্জলিই প্রদান করুক, অন্যত্র এ দৃশ্য কই বড় একটা দেখ যায় না। বেশভূষায়, আচারব্যবহারে, মানমর্য্যাদায় লক্ষ্যও নাই, অথচ সকলই যেন স্বতঃ সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। তজ্জন্যই কবিগণ বলিয়া থাকেন মান সম্ভ্রম প্রভৃতি ইঁহাদের অনুগামী, ইঁহারা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। কটিতটে একটু বসন, সর্ব্বাঙ্গে একখানি উত্তরীয়, কখনও থাকে কখনও নাও থাকে। সমুন্নত মূর্ত্তি, বিস্তৃত বক্ষ, দীর্ঘ বাহুদ্বয়। প্রশস্ত মুখমণ্ডল হৃদয়খানি দেখাইয়া দিতেছে। ললাট অতি সুগঠন, ধপ ধপ্ করিতেছে। নাসিকায় কোন দোষ নাই। চক্ষু সমুজ্জ্বল নহে, অথচ দীনতার লেশ রাখে না; যাহাকে দেখে তাহার মস্তকে শান্তি-ধারা বর্ষণ করে। হৃদয় রাগবিরাগ হর্ষবিষাদ কোপকুটিলতার ধার ধারে না। বয়স অনুমান যৌবন ও জরার মধ্যস্থ। কেশ শ্মশ্রু স্বভাবত লম্বিত। কোথাও মলিনতার লেশ নাই, দেহখানি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে পূর্ণ। দেখিতে উলঙ্গপ্রায় অথচ স্বতই পরিচ্ছন্ন, মমতাশূন্য অথচ প্রীতিময়, নির্ব্বাণপ্রায় অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানে জাজ্বল্যমান, বয়সে প্রবুদ্ধ অথচ সরলতায় বালক। ভারতবাসিগণ যে মহাপুরুষ বলিয়া একজাতীয় পদার্থের উল্লেখ করেন, তাহা যদি শুনিয়া থাকেন, তবে একটী এই। নামটী কি আর বলিতে হইবে?, শাস্ত্রকার বলেন 'শ্রীনারদ।'

অষ্টম পল্লব।

বিমল প্রভাতে দুইটী বিমল মূর্ত্তি কালিন্দীহ্রদতীরে উপবিষ্ট। সম্মুখে পদ্মবন বিকাশোন্মুখ, অসংখ্য মধুকরে আকুল; ভ্রমরগণ যেন পদ্মগুলিকে শীঘ্র নয়ন মেলিয়া দেখিতে বলিতেছে। সরল কলহংসগুলি কলস্বরে প্রশান্ত ছবির নিকটস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে। সমীরণ মহাপুরুষের চরণে লুণ্ঠিত। তীরস্থলী আপ্যায়িতপ্রায়।

ঋষি বলিলেন—ধ্রুব, তুমি আসিলে বটে, কিন্তু পিতার গৃহ ছাড়িয়া ভাল কর নাই, তাঁহারা কত ভাবিতেছেন। জননীকে অর্দ্ধরাত্রে ভুলাইয়া আসিলে, তিনি শোকে পাগল হইয়াছেন। বনে কত বিপদ, কত হিংস্র জন্তু আছে, তুমি বালক কেমন করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবে? আমার বড় আশঙ্কা হইতেছে। ধ্রুব উত্তর করিলেন—মহাশয়! হিংস্র জন্তু সর্ব্বত্রই আছে, নগরেও বিপদের অভাব নাই। যিনি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, আমি তাঁহাকে খুঁজিতেই ত আসিয়াছি। মা পাগল হইবেন বটে, কিন্তু গৃহে থাকিলে হয়ত আমিও পাগল হইতাম। মা বলিয়াছেন, আমরা নিরাশ্রয়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বনে আছেন, আপনার ন্যায় সাধুগণ তাঁহার দর্শন পান, আপনি বলুন কি উপায়ে তাঁহার দেখা পাইব? শুনিয়াছি একবার তাঁহার দেখা পাইলেই সব দুঃখ নিবারণ হয়। ঋষি—দেখ, তা বটে, তাঁহাকে দেখিলে সব দুঃখ দূর হয় সত্য, কিন্তু আমি যদি তোমাকে বলি, যে তাঁহাকে দেখা অতি কঠিন, কত বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেও

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান না, কত ব্রাহ্মণ সজ্জন মহা আকিঞ্চন করিয়াও নিরস্ত হইয়া যান, তুমি বালক তোমার কি তত কষ্ট সাজে? তাহা হইলে কি তুমি গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিবে না? আর না ফিরিলে চলিবে কেন? এখন তাঁহার দর্শন পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব, সময়ে অবশ্য সম্ভব হইতে পারে। দেখ, সুখ দুঃখ সংসারে সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, সন্তোষ শিক্ষা করিলেই মনের কষ্ট নিবারণ হয়, তুমি সন্তোষ শিক্ষা কর, এখন গৃহে যাও, সময় হইলে আবার আসিয়া চেষ্টা করিও। ধ্রুব—আজ্ঞে না, আমি আর গৃহে ফিরিব না। আপনি প্রবোধ দিতেছেন, কিন্তু আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। মা বলিয়াছিলেন, তিনি দয়া করিয়া বালককেও দেখা দেন। আর, যে কিছু কষ্ট বলুন আমি সকলই সহ্য করিতে পারি। তথাপি তাঁহার দয়া না হয়, এবং আপনিও বালক বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন, তবে আর কোথায় যাইব? এই বনেই আমি থাকিব, শীঘ্রই আমার মৃত্যু ঘটিবে, মাও মরিবেন। আর কথা সরিল না, বালকের কণ্ঠ সহজেই রুদ্ধ হইল। হায়! ধ্রুব এক একবার ভাবিলেন ঋষিগণ কি স্বার্থপর।

ঋষির অক্ষোভ হৃদয় গলিয়াও গলে না। বলিলেন—আচ্ছা ধ্রুব, কাঁদিও না, দেখি তোমার কিছু উপকার করিতে পারি কি না। তোমার মাতা সত্যই বলিয়াছেন, বনে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় আছেন। আচ্ছা, সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে, এস দেখি? তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে ধ্রুব, সাবধানে এস। ঋষি উঠিলেন, প্রাণে আশ্বস্ত হইয়া বালকটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ

চলিল। নদীগর্ভে নামিয়া ধ্রুবকে যমুনাজলে স্নান করাইয়া, ঋষি দুইখানি বল্কল সংগ্রহ করিয়া বলিলেন, একখানি পরিধান কর আর একখানি উত্তরীয় কর, ও বস্ত্রগুলি এইখানেই থাক। অতঃপর বহিঃস্নানে শরীরতাপ বিদূরিত হইলে স্বেচ্ছাগত গুরুদেব প্রাণসন্তাপহর অন্তঃস্নানের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। বলিলেন ধ্রুব, কয়েকটী পদ্মপাত আন দেখি? আমি বসিব, তোমাকেও বসিতে হইবে। ধ্রুব তাহাই করিলেন, উভয়ে যথাবিধি উপবেশন হইল, সম্মুখে পত্রপুটে কিছু নির্ম্মল বারি। ঋষি বলিলেন—ধ্রুব সাবধানে শুনিবে। পরে ধীরে অনুচ্চস্বরে গম্ভীরভাবে অনেকগুলি কথাবার্ত্তা হইল। বার্ত্তান্তে উভয়ে উত্থান করিলেন। ধ্রুব পদতলে প্রণত, ঋষি অরুণোদর করকমলে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। ধ্রুবের মুখমণ্ডল বড় প্রসন্ন প্রবীণ প্রবীণ দেখা যাইতে লাগিল। তরল দৃষ্টি সহসাই কিছু বিভিন্ন আকার ধারণ করিল; যেন সমস্তই আর একভাবে দেখিতেছে, যেন অভ্যন্তরে কিছু গুপ্ত সন্ধান ছাপাইতেছে। অনন্তর উভয়ে কি উদ্দেশে গভীর বনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে বটমূলে আসিয়া ঋষি আর কয়েকখানি বল্কল দিয়া বীণাটী লইয়া প্রস্থানোন্মুখ। ধ্রুব আবার চরণস্পর্শ করিলেন। এতক্ষণে হৃদয়ে উদ্বিগ্নভাব দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে আবার দেখা পাইব? ঋষি বলিলেন ভাই, আমি কাহারও উপরোধ অনুরোধে কার্য্য করি না, তোমায় সকলই বলিয়া দিলাম, যখন আবার ইচ্ছা হইবে তখন আসিব, তোমার ব্যস্ত কি? তবে আমি আর একটী কাজ করিব, তোমার মাতাপিতাকে সব সংবাদ দিয়া

সুস্থ করিয়া যাইব। তাঁহারা এখন তোমাকে খুঁজিবেন না, তজ্জন্য চিন্তা নাই। ধ্রুব শান্তস্বরে উত্তর করিলেন—যে আদেশ। দেখিতে দেখিতে বীণাধারী গভীর বনে অদৃশ্য হই-লেন। আমাদের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল,—পিতা ধ্রুবের অনুসন্ধান স্থগিত করেন, মাতাও প্রাণে আঘাত পান নাই, তাহার কারণ এই।

নবম পল্লব।

আমরা এপর্য্যন্ত ধ্রুবমহাশয়ের পদানুসরণে নিবৃত্ত হই নাই, তাঁহার আকার ইঙ্গিতও যথামতি লক্ষ্য করিয়া নিজ সম্মান সাধ্যানুসারে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এতক্ষণে বোধ হয় নিরস্ত হইতে হইতেছে, বলবুদ্ধি পশ্চাৎপদ। অনেকে আশা করিতেছেন অতঃপর ধ্রুবচরিত্রের সারসংস্থান আরম্ভ হইবে, অনেকে হয়ত ধ্রুবের সাধ্যসাধনার সুতীক্ষ্ণ পরীক্ষায় সসজ্জ। কিন্তু বলিতে আর ইতস্ততঃ কি, আমরা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ। এই ক্ষুদ্রগ্রন্থের মতে সাধনার মূলতত্ত্ব সরল সুগম করিয়া প্রকাশ করা ও স্বর্গের একটী সিঁড়ি প্রস্তুত করা, এ উভয়ে অধিক প্রভেদ নাই। মহাশক্তিধর লঙ্কেশ্বরের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, স্বর্গের একটী সর্ব্বসুগম সোপান নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, প্রয়োজন হইলে লোকে দেবলোকে হাট বাজার করিতে যাইতে পারিবে, কিন্তু আলস্য দোষে তাহা ঘটিল না। আলস্য ত্যাগ করিলে রক্ষোরাজ সোপাননির্ম্মাণে সমর্থ হইতেন এবিষয়ে সন্দেহ করা বৃথা; কিন্তু তাহা হইলেও

তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইত কি না সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। অনন্ত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতে কয়টী পক্ষহীন দ্বিপদ সমর্থ হইত? বিশেষত কিছু ঊর্দ্ধেই অলঙ্ঘ্য হিমজালে সোপান আরুদ্ধ হওয়ায় হয়ত একটী দ্বিতীয় হিমালয় প্রস্তুত হইত মাত্র। সুতরাং স্বর্গ সেই স্বর্গেই থাকিত, লাভের মধ্যে হয়ত কোন দিন ঘোর ঝন্‌ঝনে ভূমিসাৎ হইয়া দশাননের বিরাট কীর্ত্তিটী কতশত একাননের মস্তক চূর্ণ করিত। অতএব বুঝিতে হইতেছে যে, লৌহ-সোপানে স্বর্গে আরোহণ ঘটে না, মানস-বিমানেই উঠিতে হয়। কিন্তু, বিমানারোহণে সামর্থ্য না জন্মিলে আবার বিমান দেখা যায় না, সুতরাং কেহ হাত ধরিয়া তুলিয়া দিলেও নিজ অনুভব না হইলে বসা যায় কোথায়? পরস্কন্ধে আরোহণ করিলেও স্বীয় শূন্যগতি না জন্মিলে স্বর্গপথে অবকাশ লাভ হয় না, এ পথে দর্শন ও আরোহণ শক্তি একত্রে উৎপন্ন হয় ইহাই রহস্য।

বিজ্ঞ পাঠক, ইহা স্তোকবাক্য নহে, আক্ষেপেরও বিষয় নহে। কয়েকটী কথা, যাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না, যাহার তাৎপর্য্য নিগূঢ় ভাণ্ডারে রহিয়া যাইবে, তাহা ধার করিয়া বলায় ফলোদয় কি? প্রাচীনগণের প্রসাদেই আমাদের ধ্রুবচাঁদের সহিত পরিচয়। কোন শ্রদ্ধেয় পুরাবিতের মুখে ত এরূপ কথা প্রকাশ্যে শুনিলাম না। কাহারও মুখে যাহা কিছু শুনিলাম তাহাও কেবল আমাদের মত বালক ভুলান বলিয়াই বোধ হইল। পর্য্যবসান অনুধাবন করিলে তাহাতেও সেই দূরপথে যাইয়াই পড়িতে হয়। ফলত একথা কিছুই নূতন নহে, মহামতি লোকগুরুগণ স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন—'দূরকে নিকট করা

যায় না, যাহা প্রকৃত বৃহৎ তাহা কখন ক্ষুদ্র হয় না, কে আকাশ পরিক্ষিপ্ত করিতে পারে?' অসামান্যহৃদয়ধাম অলৌকিক ভাবরত্ন লৌকিক অনুকরণে বিড়ম্বনামাত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্রুবের নিগূঢ় মূলমন্ত্র হস্তগত ভাবিয়া নৃত্য করা বস্তুত চাপল্যপ্রকাশভিন্ন আর কিছুই হয় না। নৃত্য করিতে হইলে ধ্রুবচাঁদের তীব্রসম্বেগময়, পরাবৃত্তিবিধুব, অমল, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়খানি সম্মুখে ধারণ করুন, যথেষ্ট হইবে। সাধুহৃদয় অয়স্কান্তের গুণ রাখে বটে, সে স্পর্শমণির স্পর্শে কালে তদ্‌গুণময় হৃদয়লাভের আশাও আছে বটে। কিন্তু ওজস্বী শ্রীমান্ ধ্রুব পাঁচবৎসরবয়ঃক্রমেই সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, যে পথে পরমানন্দমন্দিরে পঁহুছিলেন, কতগুণ পাঁচবৎসরেও সংসারভার সাদরে মস্তকে ধরিয়া আমরা দেখিতে দেখিতে সেই পথের পথিক হইব, এ আশা দুরাশা বলিয়াই বুঝিতে হয়। অতএব দুরাশার ছলনায় অকালে বীর বালকের সহিত গভীর বনে প্রবেশ করা কোনমতে সুযুক্তি নহে, বন-মুখে অবস্থান করিয়া ধ্রুবনিরীক্ষণই আমাদের শ্রেয়ঃকল্প।

গুরুদেব অন্তর্ধান হইলে ধ্রুবচাঁদও বটমূল ছাড়িয়া বনমধ্যে অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু প্রত্যূষে স্নানকালে একবার হ্রদতীরে দেখা দিতেন। কিছুদিন পরে মধ্যাহ্নেও একবার দেখা যাইত। ক্রমে অপরাহ্নেও আর একবার স্নানে আসিতে লাগিলেন। এইরূপ ত্রিসন্ধ্যাসমাগমে হ্রদবাসী হংসগুলির সহিত সহজেই কিছু কিছু পরিচয় হইল। বনে মনুষ্যসমাগম ত দেখাই যায় না, তবে কয়েকটী হরিণশিশু ও হরিণজননীর সহিতও কিছু স্নেহবন্ধন ঘটিল বটে। অল্পকাল পরে মধ্যাহ্নে ধ্রুবকে আর

দেখা যায় না, ক্রমে অপরাহ্নেও অদর্শন, আবার সেই এক প্রাতঃকালে। এই নিয়মভঙ্গে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বৃদ্ধি পাইল। হংসগুলি অনেকদিন ত্রিসন্ধ্যা সাক্ষাতের পর হঠাৎ ধ্রুবের অদর্শন দেখিয়া, মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্বেষণে বনে উঠিয়া গ্রীবা বাড়াইয়া আহ্বান করিত, কিন্তু সংবাদ না পাইয়া সহজেই আবার ফিরিয়া আসিত। প্রথম প্রথম ধ্রুবকে কিছু কৃশ অনুভব হইতে লাগিল, কিন্তু মুখশ্রীর কখনই হ্রাস দেখা যায় নাই। মুখের উজ্জ্বলতা দিন দিন বর্দ্ধমান, উৎসাহও দিনে দিনে বিকাশমান। একদিন প্রত্যুষে ধ্রুব অনুপস্থিত। সে দিন গেল, পরদিন, তৎপরদিন, ক্রমে মাসাবধি হইল, তথাপি ধ্রুবের দেখা নাই। হংসকয়টী অনেকবার ডাকিয়া ডাকিয়া নিরাশ হইয়া যায়, হরিণগুলিও ইতস্ততঃ করে, ক্রমে কয়েকমাস অতীত, কোন সন্ধান নাই। হঠাৎ অপরাহ্নে ধ্রুব দেখা দিলেন, হংসকয়টীর জন্য অনেক খাদ্য আনিয়াছেন। তাহারা পক্ষবিস্তার করিয়া কোলাহলে দৌড়িয়া আসিল। তাঁহাকে ছাড়ে না, কিছুকাল একত্রে বাল্যোচিত জলকেলি হইল। সে রাত্রি বটমূলেই বাস করিয়া ধ্রুব আবার প্রত্যূষে অদর্শন। আর বৎসরাবধি দেখা নাই। পরে আর একদিন উপস্থিত হইয়া অনেকদিন পূর্ব্বস্থানে বাস করিলেন। এবার আকারপ্রকারে অনেক পরিবর্ত্তন, শরীর অপেক্ষাকৃত পুষ্ট, বদনে বড় মধুরতা. হৃদয়ে কোন উদ্বেগ নাই, নিয়মবন্ধনও বড় দেখা যায় না। আনন্দে পশুপক্ষীর সহিত প্রণয়স্থাপন ও কেলি-কৌতুকে কালাতিপাত করেন। তাহাদের প্রীতি ও বিশ্বাস বড় বর্দ্ধিত হইল। পদ্মবনে উপদ্রবেরও ত্রুটি করেন না, বনে স্বাধীনভাবে

বিচরণ করেন। যেন কাহাকেও ভয় নাই, যেন প্রকৃতই ধীরোদ্ধত ক্ষত্রিয়কুমার, তবে মধুর মুখখানি দেখিয়া কাহারও বিশেষ আশঙ্কা হয় না এইমাত্র প্রভেদ।

তাইত, এ কেমন হইল? সহজেই ধ্রুব ধীর শিষ্ট, বনবাসে কি এই ফল ফলিল? তপস্যার কিরূপ লক্ষণ? দেখিতে দেখিতে ধ্রুব আর একবার অন্তর্ধান করিলেন। এবার আর কয়েকবৎসর কোন উদ্দেশ নাই। যমুনাতীরে সে মধুরমূর্ত্তির সমাগম ভুলিয়া গেল। বনেও অন্বেষণে কিছু ফল হয় না। কদাচিৎ কখন কোন প্রান্তে তাঁহারই মত কাহাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু নিশ্চয় করিবার সময় পাওয়া যায় না। কখনও কি যেন ব্যস্ততায় তদ্রূপ একজন দেখিতে দেখিতে ঘোর বনে প্রবেশ করিল। কখনও কি লক্ষ্য করিয়া উদ্ভ্রান্তচিত্ত একজন দূর দিয়া চলিয়া গেল। কখনও বা কোন দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে ঠিক ধ্রুবটীর ন্যায় কে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন মহাবিস্ময়ে কি দেখিতেছে। ইত্যাদি নানা অলৌকিক ভাবে সেইরূপ মূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হইত, কিন্তু সে সমুদয় উল্লেখ করা বৃথা, কারণ তাঁহাকে নিকটে পাওয়াই যাইত না। একদিন একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পাদদেশে সেই ধ্রুবই বসিয়া আছেন; একটী পরিচিত হরিণ দূর হইতে দেখিল, নিকটে যাইবার ইচ্ছা, কিন্তু মুখভাব দেখিয়া তাহার ভয় হইতে লাগিল, কি এক মহাচিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। অল্পে অল্পে সে পশ্চাৎ দিয়া নিকটে পঁহুছিল, সাহসে মস্তক আঘ্রাণ করিল, তথাপি ধ্রুবের চৈতন্য নাই, সে ক্রমে স্নেহের প্ররোচনায় মৃদু মৃদু লেহনে প্রবৃত্ত হইল। চমক ভাঙ্গিয়া ধ্রুব তাহাকে চিনিলেন, আদর

করিলেন, কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া ভুলাইয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। আর কই কেহ কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না।

ক্রমে পশুপক্ষিবৃন্দের মৈত্রীবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অনেকে এ পান্থধাম একেবারেই পরিত্যাগ করিল। হায়! ধ্রুবও বুঝি আর দেখা দেন না! দুরন্ত বিজন অরণ্য এইবার দুঃখিনী সুনীতির হৃদয়বত্ন বুঝি চিরদিনের তরেই গ্রাস করিল! কাল এই কথার প্রতিপাদনেই প্রযাসী বটে, হৃদয় কিন্তু কিছুতেই স্বীকারে প্রস্তুত নয়। কালের নিযন্তা বিধাতা, তুমিই তত্ত্ব বলিতে পার, এ কথা কি সত্যই হইবে?

বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় বনভূমি বাহ্য সাজ পরিবর্ত্তন করিতেছে। অভ্যন্তর সহজে ধরা দিবার নহে; ধীরে ধীরে দুই এক পদ বিচলিত হইতেছে, কিন্তু সহজ মানুষের চক্ষে বড় একটা ঠেকিতেছে না। যাবতীয় সংসারেই অভ্যন্তরের এই এক গতি। কেমন নিঃশব্দে ঘূর্ণমান হয়, অন্যে চক্ষে পড়ে না, যখন পড়ে তখন বিস্মিত করিয়া দেয়।

বর্ষা অতীত, যে শরতে ধ্রুব অরণ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই শরৎ আবার আসিয়া উপস্থিত। সেই আর কই? মধ্যে একাদশটী চলিয়া গিয়াছে, আমরা মনপ্রবোধ দিয়া সেইই বলিতেছি। অরণ্যতল পরিধৌত, তরুলতা স্নানশুদ্ধ, আকাশ নীলকান্তময় উচ্চাসনে আরূঢ়, নিম্নে যমুনাজল তরলাকাশবৎ প্রশান্তবেগে ধাবমান। এক দিন অকস্মাৎ ধ্রুবচাঁদ মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইলেন, লাবণ্য জ্যোৎস্নায় যমুনাতীর আলোকিত। আর কোন অতি-ভৌতিক ভাব নাই, পূর্ব্বের সহজ লক্ষণগুলিও তৎসঙ্গে সমুদয় অদৃশ্য হইয়াছে। মুখকান্তি

পরিমৃষ্ট, শরীর সম্বর্দ্ধিত ও পরিমিত পরিপোষে পূর্ণ, হৃদয় নিরুদ্বেগ। দেহরাজ্যে একটী সুস্পষ্ট আমূলচূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধিক আর কি? আজ ধ্রুবের অভিলাষ পূর্ণ, দুরন্ত অন্তরতিমির দূরীভূত। সে দিন উপদেশকালে যে নিরাময় ছবিখানি নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, আজ কি যেন কুহকে ধ্রুব সর্ব্বাংশে তাহার সাদৃশ্যোন্মুখ হইয়াছে। কোন অলৌকিক আকর্ষণবলে আকুল হৃদয়প্রবাহ ফিরিয়া গিয়াছে। নানামুখ পরিত্যাগ করিয়া সেই এক নিশ্চিত প্রশান্ত গতি ধারণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র অন্তরে, ক্ষুদ্র পেটিকায় সেই মহান্ ভাব-রত্নগুলি সমস্তই অঙ্কুরাকারে সন্নিবিষ্ট, যে চিনে সে নিমেষেই চিনিয়া লইতে পারে।

ভাগ্যবতী সুনীতির অবোধ বালক আজ কি কৌশলে প্রবোধ-উৎসের সন্ধান পাইয়াছে। জননীর সার উপদেশ চরিতার্থ, ক্রোধ অভিমান সমূলে সমুৎখাত, হৃদয়-ক্ষেত্রে অক্ষয় মৈত্রীবীজ রোপিত হইয়াছে। মলিনহৃদয় বনে ধাবিত হইয়াছিল, কাহারও নিকট অভিযোগ করিবে, আজ নির্ম্মল হৃদয় যেদিকে ফিরিতেছে সেই দিকেই সেই মহিমাময় রাজরাজের অমৃতচ্ছবি দেদীপ্যমান দেখিতেছে। অভ্যন্তরেই অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় প্রতিমা গ্রথিত, অন্তর বাহির জ্যোতির্ম্ময়, জল স্থল আকাশ, উচ্চ নীচ, স্বর্গমর্ত্ত একাকার। প্রাণ পরমাশ্চর্য্য অদ্বৈতসাগরে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। অভিযোগ করিবে কি? কিসের অভিযোগ বুঝিতে পারিতেছে না। অভিমান করিবে কি? অভিমানপদার্থের আর উপলব্ধি হইতেছে না। ক্রোধ কাহার উপর করিবে? আত্মপর

ভুলিয়া গিয়াছে। আজ আর্য্যগণের ধারণায় বালকের ক্ষুদ্রা-ত্মায় বিশ্বাত্মার ছায়া, বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় চিত্রে পূর্ণ, ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখে অন্তর আপ্যায়িত, ছিন্নমূল সংসারদুঃখ পরাস্ত।

যে দুএকটী পশুপক্ষী মহাপুরুষ-দর্শন-সৌভাগ্যে এখনও ধরাধামে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের পূর্ব্বসুহৃদ্‌কে চিনিতে বড় বিলম্ব হইল না। ধ্রুব কয়েকমাস শান্তভাব শিখাইয়া তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিলেন। এক দিন প্রভাতে মুদ্রিত-নেত্রে বসিয়া আছেন, একখানি স্নেহ-তুষার-ময় হস্ত ধীরে শিরঃস্পর্শ করিল। সসম্ভ্রমে উঠিয়া ধ্রুব আনন্দে তটস্থ প্রশান্তকান্তি গুরুদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। বালকের জটামণ্ডিত শির গুরুভারে তৎক্ষণাৎ চরণে লুণ্ঠিত হইল, আজ বড় শোভায় চরণরেণু কমলরজশ্ছটা পরাজয় করিল। ঋষি বলিলেন, কি সংবাদ, ধ্রুব ধ্রুবের সাক্ষাৎ পাইল? কৃতাঞ্জলি-পুটে ধ্রুব উত্তর করিলেন, সকলই শ্রীচরণের প্রসাদ।

অনুচিত গম্ভীরভাব দেখিতে দেখিতে ঋষিবদনে বিকাশ পাইল, অতি শান্ত পরিস্ফুটস্বরে বলিলেন,—ধ্রুব! এখন ও স্পষ্ট বলিতে হইতেছে? আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কয়েকটী কথার কথা তোমায় বলিয়া গিয়াছিলাম, কি দেখিলে বল দেখি? কেমন আকার? আমায় ত একবার দেবতা দেখাইতে হইবে?

গুরুর মহত্ত্ব বুঝিয়া ধ্রুব অঞ্জলি দৃঢ়বদ্ধ করিলেন, উত্তর কি দিবেন? হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিল, কণ্ঠ জড়ীভূত, নয়নে অশ্রু-কণা দেখা দিল। হায়! মানুষের কণ্ঠ, মৃণ্ময় উপাদান, সে

অমানুষ রূপ প্রকাশের শক্তি কোথায়? ঋষির উদার বীণা গান করিল, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। বনগহন তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া সে অপূর্ব্ব ধ্বনির প্রতিধ্বনি গ্রহণ করিল, যমুনা কল কল করিয়া উঠিলেন। ত্রিগুণময় ত্রিতন্ত্রী শৈশবে যাহা স্পষ্টস্বরে শুনাইতে পারে নাই, আজ মহোচ্চতানে জগতের সেই মহোচ্চগান কৃতকার্য্য শিষ্যকে শুনাইয়া নিজেও কৃতার্থতা লাভ করিল। সত্য সত্যই বনের পশু দৌড়িয়া আসিল। হায়! সেকালের পশুও ধন্য।

গানাবসানে ঋষি বলিলেন,—আচ্ছা বুঝিলাম, তা ধ্রুব এখন বনেই থাকা মত? আর গৃহে যাইবার প্রয়োজন কি? ধ্রুব—যে আদেশ। ঋষি—না ধ্রুব, আদেশ অদ্যই যাত্রা কর, জননী বড় কাতর। আর দেখ, আমার বীণাটী অতি পুরাতন হইয়া গিয়াছে, রাজা হইয়া একটী সোণার বীণা গড়াইয়া দিও; এখন বুঝ ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা। সস্মিতবদনে ধ্রুব গুরুদেবের চরণানুসরণ করিলেন, কিয়ৎকাল যমুনাতটে ভ্রমণ ও সদালাপের পর, ঋষি কৃতী শিষ্যকে একটী সর্ব্বাঙ্গীন আলিঙ্গন দিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

অপরাহ্ণেই ধ্রুব মধুবন পরিত্যাগের উদ্যোগ করিলেন, সমীরণ অগ্রসর, কিন্তু অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে প্রায় সন্ধ্যাপর্য্যন্তই অপেক্ষা করিতে হইল। গোধূলি-সমাগমে তাহাদের নিজ গৃহে দেখিয়া তিনি হ্রদ প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করিলেন। আহা! পশুগুলি, পরদিন তাঁহাকে না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইল, কত দিন আহারবিহারের মধ্যে সময় সময়

উৎকণ্ঠিত হইয়া কি যেন চিন্তা করিত, তবে কালে সকলেই ভুলিয়া গেল বটে।

ধ্রুবচরিত্র সম্পূর্ণপ্রায়, বিশেষ কথা আর বড় অবশিষ্ট রহিল না। ধর্ম্মের যথাসর্ব্বস্ব আয়ত্ত করা আমাদের এ উদ্যোগে ঘটিল না। ধ্রুবের গতিবিধি অনেকাংশে জানিতে পারিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার মূলমন্ত্র কিছুতেই হস্তগত করিতে সমর্থ হইলাম না। দূর হইতে আমরা ধ্রুবকে দিব্যপথে জাজ্বল্যমান নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু সে মহামণ্ডপে কোন মহামহীয়ান্ দেবতার সহিত কিরূপ দিব্যভাষায় তাঁহার কি অপূর্ব্ব আলাপ হইল, তাহা শ্রবণে আমাদের শ্রুতি পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। তা আমরা এতদূর আশাও করি নাই। কৌতূহল যথেষ্ট জন্মিয়াছিল, কিন্তু আশাতিগ কৌতূহল কোনমতে চরিতার্থ হইল না। তবে ধ্রুবচরিত্রের অনুশীলনে যাহা হইল না, ধ্রুবের সাক্ষাৎ পদসেবায় তাহা হইতে পারিত কিনা এ কথা কে বলিতে পারে? ধ্রুব আজ কোথায়? প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে বহুদিন হইল একখানি ছবিমাত্র আমাদের হৃদয়ে রাখিয়া সোণার ধ্রুব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ কালের অলঙ্ঘ্য শাসনে ছবিখানি যাহা করিতে পারিল না, ছবির জ্বলন্ত আদর্শ তাহা পারিত কিনা, কল্পনা ইহার উত্তর প্রদান করুক। যাহা হউক যতদূর আমরা এখন বুঝিলাম, তাহাতে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই রহিল না, যে, প্রাচীনকালে ধর্ম্মপথে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হইত, আংশিক অথবা পূর্ণপ্রমাণে কোন সজীব দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধার্ম্মিকগণ চরিতার্থ হইতেন। হায়!

এখনকার ধর্ম্মে কি সে সাক্ষাৎকারের নাম আছে? তবে আর সেরূপ চরিতার্থতার আশা কি?

দশম পল্লব।

ফাল্গুনের নিশা অবসানপ্রায়, প্রহরমাত্র অবশিষ্ট। যমুনা অর্দ্ধপথে কুলুকুলু করিয়া চলিয়াছেন। প্রান্তে একটী সপ্তদশ বৎসরের বালক উপবিষ্ট, বল্কলধারী বেশ।

আকাশের গায় কপোতের বর্ণ তরল অন্ধকার এখনও মাখান রহিয়াছে। উপরের রাজদরবার ভগ্নপ্রায়, অনেকগুলি নক্ষত্রই স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছে। কয়েকটীর বুঝি গৃহে কেহ নাই, যাইতেও ইচ্ছা নাই, বিবর্ণভাবে ইতস্ততঃ করিতেছে। দুএকখানি মেঘ সকলকে পাছে করিয়া তরতরে চলিয়া যাইতেছে।

যমুনার জল কাল, দূরে বড়ই কাল; এক আধখান তরণী সে কালিমায় অর্দ্ধেক মিশিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চলিয়াছে। পরপারটী এখনও অনস্তিত্বের গর্ভে, একখানি সুদীর্ঘ কুয়াসার তিরস্করণী নয়নে হস্তার্পণ করিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই চারিটী গাছ দেখা না যাইলেও যাইতেছে। ক্রমে সংশয়ের অধিকারই আসিতেছিল, হঠাৎ সে কল্পনার রাজ্য হইতে কয়েকটী কোকিল যমুনার জল বিকম্পিত করিয়া অস্তিত্বের পক্ষ সমর্থন করিল। এ পার হইতে কতগুলি পাপিয়াও কি যেন ত্বরিত জবাব দিয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রোধে অধীর, আর

উত্তর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা নাই, মুহূর্ত্তমধ্যে অজস্র কোলাহলে জল স্থল আকাশ পরিপূর্ণ।

আমাদের সন্ন্যাসী বালকটীর কাণে যেন কিছুই গেল না; সুপ্তশিশুর মুখে দুগ্ধধারার ন্যায় সুধাধারা গড়াইয়াই পড়িয়া গেল; তিনি সেই এক ভাবেই বসিয়া আছেন। কিন্তু সমীরণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; উঠিয়াই সত্বর এদিক্ ওদিক্ পরিদর্শনে চলিলেন। পরোপকার-জীবন ফুলগুলি পূর্ব্বাহ্ন হইতেই ফুটিয়া প্রস্তুত; কেহ কেহ সময় বুঝিয়া অতৃপ্তহৃদয়ে সহাসবদনে আত্মবিসর্জ্জনই করিল।

ক্ষণপরে ব্রাহ্মণগণ অর্ঘ্যপাত্রহস্তে মৃদু মৃদু ইষ্টনাম গান করিতে করিতে প্রাতঃস্নানে উপস্থিত। সে গান যেন পঞ্চম ধ্বনি হইতেও উচ্চ, সন্ন্যাসীর শরীর কণ্টকিত করিল, তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। ব্রাহ্মণগণ সে ঘাটে নামিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে দেখিলেন না।

আঁধার এখনও ছাড়ে নাই। একে একে অনেকগুলি শিবিকা আসিয়া ঘাটের উপর মিলিত হইল। কয়েকখানি উদ্ঘাটিত; ফলফুল হস্তে মূর্ত্তিমতী উষার ন্যায় কয়েকটী গৃহলক্ষ্মী কালিন্দীতীরে অবতীর্ণ হইলেন। লজ্জার মৃদু আঁধারে স্বর্ণকান্তি বদন ঢাকা, হৃদয়ে স্নেহের শিশির, সর্ব্বত্র পুণ্যের সমীরণ, তবে উষা বই কি? ধীরগমনে ভারতের প্রত্যক্ষ দেবীবৃন্দও অবগাহনে অগ্রসর। জলের নিকট উপস্থিত হইয়াই আঁধারে মাণিকের ন্যায় ধ্রুবধনে দৃষ্টি পড়িল। নয়ন মুদ্রিত, ললাট ঝকিতেছে, ভীরু জটাগুলি যেন বদন লুকাইতে চায়, প্রভাত বায়ু মানা করিতেছে। স্নান ভুলিয়া নারীগণ চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন।

ইতিমধ্যে একটী সমৃদ্ধবেশা রূপলাবণ্যবতী তাঁহাদের পার্শ্বে উপস্থিত। সকলে সসম্ভ্রমে অবকাশ প্রদান করিলেন। রমণী একটু নিকটে গিয়া, বালকের মুখে দৃষ্টি পড়িবামাত্র উৎকণ্ঠিত চিত্তে একেবারে ললাটে হাত দিয়া জটামণ্ডল অপসারিত করিলেন। আর সংশয় রহিল না; ধ্রুব চরণ স্পর্শ করিতে করিতে বাহুযুগলে দৃঢ়বন্ধন করিয়া কোলে উঠাইলেন, নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল।

অচিরে আর একটী অঙ্গনাও সেই দিকে অগ্রসর। পরিচ্ছদ উচ্চ অঙ্গেরই বটে, রূপের কৃপণতা নাই, কিন্তু কান্তি ক্ষীণপ্রায়, আননে কি যেন ব্যথা অকৃত্রিম বিনম্রতার অন্তরালে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র ধ্রুব নামিয়া চরণে লুণ্ঠিত হইবেন, মুখমণ্ডলে ললনার দৃষ্টি পড়িল। হায়! চেতনা আর সহিল না, দৃষ্টিহারা হইয়া সুনীতি পার্শ্ববর্ত্তিনীর হস্তে পড়িলেন। সকলে সসম্ভ্রমে যমুনার জল আনিয়া শুশ্রূষা করিল, প্রকৃতিস্থ হইয়া জননী দীর্ঘকালের হারাণরত্নে আবার বক্ষে ধরিয়া বদন চুম্বন করিলেন; অশ্রু বারম্বার আসিয়া দর্শনসুখে বাধা দিতে লাগিল।

যিনি প্রথমে কোলে লইয়া ছিলেন, তিনি ধ্রুবের বিমাতা সুরুচি দেবী। তিনি রাজভবনে সংবাদ দিতে বলিয়া অবিলম্বে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া স্বহস্তে ধ্রুবকে স্নান করাইলেন, শীঘ্রই পরিচ্ছদ আসিয়া পঁহুছিল, পুত্রধনে সাজাইয়া মাতৃদ্বয় স্নানে নামিলেন।

ত্বরায় একখানি রথ আসিয়া তটোপান্তে [illegible] দিল, দ্রুতপদে অবতীর্ণ হইয়া কুমার উত্তম অগ্রজের চরণে [illegible] হইলেন।

আলিঙ্গনান্তে উভয়ে রথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, পরিজন যথাযোগ্য অভিবাদনাদি সমাপন করিল, অনন্তর স্নান হইলে শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ ধীরে ধীরে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে অনেকগুলি মালা পতাকা সৌধাগ্রে দেখা দিয়াছিল; রাজপথও জলস্নাত হইয়াছিল; দ্বারে বাতায়নে ধূপধূম হেলিয়া হেলিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল; নহবত মৃদুতান আরম্ভ করিয়াছিল। আহ্বান-সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ধ্রুব একাদশবর্ষান্তে পিতার ভবনে প্রবেশ করিলেন।

উপসংহার।

অতঃপর ধ্রুব যেভাবে জীবনাতিপাত করেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহাকে রাজ্যপালনাদি সকলই করিতে হইয়াছিল; বিমাতার বা বৈমাত্রেয়ের তাহাতে অণুমাত্র আপত্তি হয় নাই। বিমাতার ইদানীন্তন ভাব আমরা মিলনমুখেই কিছু ব্যক্ত করিয়াছি, কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় তাঁহার কাছে পিতার আদর ও সখার প্রণয় পাইয়া পরিতৃপ্ত ছিলেন। ফলে তিনি সকলেরই সম্পূর্ণ আশ্বাসস্থল হইয়া উঠেন; তাঁহার নিকট কাহারও মানমর্য্যাদার কখনও অণুমাত্র ত্রুটি হয় নাই।

দুঃখিনী জননীর আনন্দের কথা আর কি বলা যাইবে? পুত্রধনে দেখিয়া তাঁহার আর পরিতৃপ্তি হইত না, কতদিন পর্য্যন্ত কোলে লইলেই সেই অশ্রু আসিয়া দর্শনে বিঘ্ন জন্মাইত। কিন্তু সুনীতিকে দেখিয়া চিরদিন সেই সুনীতি বলিয়াই বোধ হইত; তিনি কখন পূর্ব্ব বিনম্রতা ত্যাগ করেন নাই। ফলে পুত্রের বিজয়োৎসবে সাধ্বীর হৃদয় বরং সমধিক মৃদুতাময় হইয়াছিল। তবে তিনি গোপনে পুত্রকে সেই স্বর্ণবর্ণ পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। শৈশবের সেই আমার অবোধ ধ্রুব সত্য সত্যই দেবদুর্লভ শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাইয়াছে, হায়! আমাকে কি একবার দেখাইবে না, এই আশায় জননী নির্জ্জনে পুত্রধনের নিকট হৃদয়াভিলাষ ব্যক্ত করিতেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়া ধ্রুব মাতার ঋণ শোধে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু অচিরেই সেই আদিত্য-

বর্ণ পুরুষকে অবলা হৃদয়মন্দিরে আনিতে পারিয়াছিলেন একথা আমরা বলিতে সাহস করি না। একটী আশ্চর্য্যের কথা শুনা যায়, ভ্রাতা অকালে কোন বিদেশীয়ের হস্তে নিহত হওয়ায় একবার তিনি একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধের উদ্যোগ করেন; কিন্তু কাহারও উপদেশে যুদ্ধ কার্য্যে পরিণত হয় নাই, উপক্রমেই উপসংহার সাধিত হয়। সেই অবধি মনোযোগী হইয়া শোকাতুরা বিমাতাকেও দুরন্ত দুঃখভূমি অতিক্রমে বিশেষ সাহায্য করেন। বলা বাহুল্য শাস্ত্রকার বলেন, পরিণামে তাঁহার অক্ষয় সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ হয়, কিন্তু আর বনে যাইতে হয় নাই, অদ্ভুত একাগ্রতাবলে তিনি শৈশবের কয়েকবৎসরেই বনের কার্য্য নিঃশেষে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

অবশেষে এই একটী গুরুতর আকারের প্রশ্ন দাঁড়াইতে পারে যে, ধ্রুব গৃহধর্ম্ম সবই করিলেন বটে, কিন্তু প্রধান কর্ত্তব্যটীর কি করিলেন? বিশাল সংসার যে সেই পুরাতন অবস্থাতেই তাঁহার মুখপ্রেক্ষী হইয়া রহিল, তাহার মুখরক্ষার কি উপায় করিয়া গেলেন? এ প্রশ্নের বিস্তীর্ণ আলোচনার জন্য কয়েক পৃষ্ঠা আমাদের অবশিষ্ট রাখিতে হইল। সংক্ষেপে দুই এক কথা পূর্ব্বে বলা না হইয়াছে এমন নয়, এস্থলে পুনর্ব্বার তিনটী কথার সূচনা মাত্র আমরা করিতেছি। এক কথা—হয়ত আমাদের ন্যায় ধ্রুবের চক্ষে বিশ্বনিয়ন্তার কর্ত্তব্যাবশেষ বিশেষ কিছু লক্ষিত হইল না। আর এক কথা—আমরা রোগী যেরূপ আশু প্রতীকার আহার-ঔষধ [illegible]ইলাম, চিকিৎসকের হয়ত সেরূপ হঠপ্রয়োগ সুব্যবস্থা বি[illegible]না হইল না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, ধ্রুব দ্রুতপদে ধাবমান হইয়া পুরের মুখপানে

উপসংহার।

...ইবার আর অবসরই পাইলেন না। সূত্রক্ষিপ্ত চন্দ্রমাটীর ন্যায় তিনি নিজ কক্ষপথে এক মনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অথচ উচ্ছলিত অমৃতচ্ছটায় স্বভাবতই জগৎ আলোকিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, আর অধিক আমাদের বক্তব্য নাই, একটী মাত্র কথা না বলিলে ভাল দেখায় না, গুরুদেব মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেন, কিন্তু সুবর্ণের বীণাটী কই কখনও লইয়া যান নাই। ধ্রুব অবশ্যই গুরুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন ; পাঠক মহাশয় ইচ্ছা হইলে একবার অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পারেন।

সম্পূর্ণ।